ইউনিট
৬

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ
International Management Practices in Bangladesh

ভূমিকা

সাধারণত আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপনার যে প্রয়োগ বা চর্চা করা হয়, তা-ই আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা। অর্থাৎ ব্যবস্থাপনার চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা কোনো নির্দিষ্ট দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিভিন্ন দেশে ব্যাপৃত হলে তাকে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা বলে। ব্যবস্থাপকগণ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বহুমুখী সংস্কৃতি মোকাবিলা করে বহুজাতিক সীমানায় প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জনের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করে থাকে। সুতরাং ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া বিভিন্ন দেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৈতিকতা, সামাজিক দায়িত্ব প্রভৃতি উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। তাই ব্যবস্থাপকদেরকে কোনো দেশে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হলে সে দেশের পরিবেশ-পরিস্থিতি, জনগণের মন-মানসিকতা, সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা অবলম্বন করতে হবে। এই ইউনিটে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে। ব্যবস্থাপকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এ বিষয়ে সম্যক ধারণা অর্জন করতে হবে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়:	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৬.১ :	আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার ধারণা; বৈশিষ্ট্য; গুরুত্ব; কার্যাবলি, অগ্রগতির কারণ
পাঠ-৬.২ :	আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের পদ্ধতি; সফলতার উপাদান; আন্তর্জাতিক কৌশল; আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের ঝুঁকি
পাঠ-৬.৩ :	পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনা পরিবেশ কী? ব্যবস্থাপনা পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান; আন্তর্জাতিক পরিবেশ কী? আন্তর্জাতিক পরিবেশের উপাদানসমূহ; আন্তর্জাতিক পরিবেশের উপাদানগুলোর চ্যালেঞ্জসমূহ একজন ব্যবস্থাপককে কেন ব্যবসায় পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়?
পাঠ-৬.৪ :	আন্তর্জাতিক ব্যবসায় সংগঠন হিসাবে বহুজাতিক কোম্পানি; বহুজাতিক ব্যবসায়ের পরিবর্তন: দেশকেন্দ্রিক থেকে বিকেন্দ্রিক পরিচিতি; বহুজাতিক কোম্পানির সুবিধা-অসুবিধা
পাঠ-৬.৫:	বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির কেস স্টাডি; বাংলাদেশে পেশা হিসাবে ব্যবস্থাপনার আত্মপ্রকাশ
পাঠ-৬.৬:	দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার পার্থক্য; বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার সমস্যা ও সমাধান

পাঠ-৬.১ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার ধারণা; বৈশিষ্ট্য; গুরুত্ব; কার্যাবলি; অগ্রগতির কারণ

Concept of International Management; Characerstics, Importances, Causes of Progress

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব, কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবেন;
- আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার অগ্রগতির কারণ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা কী?

What is International Management?

'আন্তর্জাতিক' শব্দটির অর্থ হলো- দেশের সীমানা পেরিয়ে অন্য কোনো দেশে বা বিশ্ব পরিমণ্ডলে কোনো কিছু ঘটে যাওয়া। আর আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা বলতে ব্যবস্থাপনার ধ্যানধারণা, চিন্তাভাবনা নির্দিষ্ট কোনো দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ব্যাপৃত হওয়া বা প্রয়োগ করার প্রক্রিয়াকে বুঝায়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বহুমুখী সংস্কৃতি, বিরাজমান। আন্তর্জাতিক সীমানায় প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যার্জনের জন্য ব্যবস্থাপকগণ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করে থাকে। অর্থাৎ, ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াটি বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি, নৈতিকতা, সামাজিক দায়িত্ব প্রভৃতি উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়।

Bartol & Martin বলেন, "আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা, সংগঠন, নেতৃত্বদান ও নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াকেই আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা বলে।" (International Management is the process of planning organizing, leading and controlling in organization engaged in international business.)

Weirich & Koontzএর মতে, "আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন দেশে (নিয়ন্ত্রক দেশ) পরিচালিত কার্যক্রমের উপর আলোকপাত করে। এটি দেশের সীমানার বাইরে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে মানুষ, পণ্য ও অর্থের প্রবাহের সাথে সম্পর্কিত ব্যবস্থাপনা বিষয়সমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট।" (The study of International Management focuses on the operation of international firms in host countries. It is concerned with managerial issues related to the flow of people, goods and money, with the ultimate aim of managing better in situation that involve crossing national bounderies.)

আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা বিশ্ব পরিমণ্ডলে বিভিন্ন সংস্কৃতি ও পরিবেশে এবং বিভিন্ন মনের ও মানের মানুষ নিয়ে কাজ করে থাকে। তাই এ ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তনশীলতাও বেশি। সুতরাং এক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকদেরকে খুব সতর্কতার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। যাহোক, উক্ত আলোচনা থেকে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার কতিপয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়;

১. আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা দেশের বাইরে ভিন্ন পরিবেশে কাজ করে।
২. এটি বিভিন্ন সংস্কৃতি থেকে আসা বিভিন্ন মূল্যবোধে বিশ্বাসী মানুষ নিয়ে কাজ করে।
৩. এটি নিয়ন্ত্রণকারী দেশের আইনকানুন মেনে চলে।
৪. এটি বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উপাদানসমূহ বিবেচনায় রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।
৫. এ ব্যবস্থাপনাকে নিয়ন্ত্রণকারী দেশের পরিবেশকে বিবেচনা করে প্রযুক্তি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, যে ব্যবস্থাপনা নিজ দেশের সীমানার বাইরে অন্য দেশ বা দেশসমূহে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনা করত সুষ্ঠুভাবে লক্ষ্যার্জনের জন্য নিয়ন্ত্রণকারী দেশসমূহের (host countries) পরিবেশ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, কর্মরত কর্মীদের মূল্যবোধ, বিশ্বাস প্রভৃতি বিবেচনা করে ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করে থাকে, তাকে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা বলে।

আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য

Characerstics of International Management

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যবসায়ে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা, সংগঠন, নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়াকে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা বলে। অর্থাৎ ব্যবস্থাপনার ধ্যানধারণা, চিন্তাভাবনা নির্দিষ্ট কোনো দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ব্যাপৃত হওয়া বা প্রয়োগ করার প্রক্রিয়াকে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা বলে। সংজ্ঞা থেকেই আমরা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার কতিপয় বৈশিষ্ট্য পাই। নীচে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হলো:

১. **দেশের সীমানার বাইরের কাজ:** আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা নিজ দেশের সীমানা ছাড়িয়ে ভিন্ন কোনো দেশে কাজ করে। অর্থাৎ, বিদেশে কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করা হয়।

২. **ভিন্ন সংস্কৃতি:** বিভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতিতে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা কাজ করে। ফলে এ ব্যবস্থাপনার কাজ অনেকটাই চ্যালেঞ্জিং। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতের মানুষদেরকে পরিচালনা করতে হয়।

৩. **বিদেশি আইন মেনে চলতে হয়:** যেহেতু দেশের বাইরে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনার কাজ, তাই সংশ্লিষ্ট দেশের এবং আন্তর্জাতিক আইনের পরিমণ্ডলে থেকে ব্যবস্থাপনার কাজ পরিচালনা করতে হয়।

৪. **রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ:** আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার যে-কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে সংশ্লিষ্ট দেশের এমন কি বিশ্বের অন্যান্য দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ বিবেচনা করতে হয়। কারণ, বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে ব্যবস্থাপনার যে সিদ্ধান্ত বা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে, ইউরোপ বা আফ্রিকার দেশগুলোতে সে রকম হবে না।

৫. **প্রযুক্তির প্রয়োগ:** যে দেশে প্রতিষ্ঠান কাজ করবে, সে দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে প্রযুক্তি প্রয়োগ করতে হবে। কারণ, পরিবেশ মূল্যায়ন করে নির্ধারণ করতে হবে যে, সে দেশে কোন্ ধরনের প্রযুক্তি কার্যকর বা যুক্তিযুক্ত।

৬. **ভিশন ও মিশন প্রতিষ্ঠা:** আন্তর্জাতিক পরিবেশ-পরিস্থিতি বিশ্লেষণপূর্বক প্রতিষ্ঠানের ভিশন ও মিশন ঠিক করতে হবে। ভিশন হলো- কোনো কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময়ে কোম্পানি কী অর্জন করতে চায়, তার বিবরণই হলো ভিশন। আর ভিশনে পৌছানোর জন্য বিশদ কর্মপরিকল্পনাকে মিশন বলে।

৭. **প্রতিযোগিতা মোকাবিলা:** বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত প্রতিযোগিদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। এ জন্য আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনাকে প্রতিযোগিতার কথা বিবেচনা রেখে ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

৮. **মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা:** আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনাকে সফল হতে হলে দক্ষ মানবসম্পদ নিয়োজিত করতে হবে। বিশেষ করে বিভিন্ন ভাষায় যোগাযোগ করতে সক্ষম, প্রযুক্তির জ্ঞানসম্পন্ন মানবসম্পদ নিয়োজিত করা আবশ্যক।

৯. **যোগ্য নেতৃত্ব:** আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে মানুষকে পরিচালনা যোগ্য নেতৃত্বের প্রয়োজন। নেতৃত্ব হলো- মানুষকে প্রভাবিত ও উদ্বুদ্ধ করে কাজ করিয়ে নেওয়া। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা যোগ্য নেতৃত্ব বাছাই করে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করে থাকে।

১০. **পরিকল্পনা থেকে নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত কার্যক্রম:** যে-কোনো ব্যবস্থাপনাকে পরিকল্পনা থেকে শুরু করে নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত সব কাজ করতে হয়। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এ কাজগুলো খুব দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা। পরিকল্পনা হবে বিশ্বের বাজারকে সামনে রেখে। সংগঠন কাঠামো হবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে সামনে রেখে। যেন বিশ্বব্যাপী কর্মী সংগ্রহের উৎস নেতৃত্ব হবে- বিভিন্ন সংস্কৃতি বিবেচনায়। যোগাযোগ হবে উন্নত এবং বিভিন্ন বিষয়ের সমাহারে হবে প্রতিবেদন। সুতরাং বলা যায় যে, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনায় উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ পরিলক্ষিত হয়।

আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব

Importance of International Management

বর্তমান যুগ হলো প্রতিযোগিতার যুগ। বিশ্বব্যাপী তীব্র প্রতিযোগিতা বিরাজমান। তাই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে হলে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা কার্য পরিচালনায় দক্ষ হতে হবে। যে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা যত

দক্ষ, সে প্রতিষ্ঠান তত উন্নত, তাই আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অপরিসীম। নীচে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের গুরুত্ব তুলে ধরা হলো:

১. **পরিবেশ মূল্যায়ন (To Evalute Environment):** আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা বিশ্ব পরিমণ্ডলে যে-কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় বিশ্বের পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা বিচার-বিশ্লেষণ করে নেয়। পরিবেশকে মূল্যায়ন না করে কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা সম্ভব নয়। এ পর্যায়ে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অপরিসীম।

২. **সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন (Making Organization Structure):** বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেন কার্যক্রম পরিচালনা করা যায় তার উপযোগী করে সংগঠন কাঠামো প্রণয়ন ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। এ ক্ষেত্রে কর্তৃত্বের ধারা দেশ-কাল-পাত্র ভেদে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনাই পারে বিশ্বের উপযোগী করে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলতে।

৩. **ব্যবসায়িক বাধা কমিয়ে আনা (Lowering Trade Barriers):** বিদেশে ব্যবসায় পরিচালনা করতে হলে সে দেশের সরকারের সাথে আলাপ-আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে পণ্যসামগ্রী (কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, তৈরি পণ্য ইত্যাদি) আমদানি-রপ্তানীর ক্ষেত্রে শুল্ক আরোপের ব্যাপারে চুক্তি করতে হয় যেন সরকার কম হারে শুল্কারোপ করে। এতে পণ্যের দাম কম পড়ে। ফলে বাজারে তুলনামূলক কমমূল্যে পণ্য বিক্রি করা যায়। এ ধরনের বাধাকে শুল্কসংক্রান্ত বাধা বলে। দক্ষ ব্যবস্থাপনাই পারে এ কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে।

৪. **সরকারি বিদেশি বিনিয়োগ (FDI):** যত বেশি বৈদাশিক বিনিয়োগ, তত বেশি উন্নয়ন। তাই বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকে। ব্যবস্থাপনাকে যে সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে হবে। অর্থাৎ, সময়মত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যেন সরকার ঘোষিত সুবিধা পাওয়া যায়। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনাকে সে ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. **তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার (Use of Information Technology):** প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনাকে প্রতিনিয়ত তথ্যসমৃদ্ধ করতে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। বিশেষ করে ইন্টারনেটের ব্যবহার বাড়িয়ে দিতে হবে। এতে ব্যবস্থাপনার পরিচালনা খরচ অনেক কমে যায়। এর মাধ্যমে বিশ্বের যে-কোনো প্রান্তে তথ্য-উপাত্ত ছড়িয়ে দেয়া যায়। এতে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার পরিচালন ব্যয় কম হয়।

৬. **কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি (Create Employment Opportunity):** বিদেশের বাজারে প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার জন্য দক্ষ লোকবলের প্রয়োজন। তাই দেশে বা বিদেশে যত বেশি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হবে, তত বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং বেকার সমস্যা দূর হবে। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে লোকবল সংগ্রহ করে থাকে। এভাবে সংশ্লিষ্ট দেশসহ অন্যান্য দেশেরও বেকার সমস্যা সমাধানে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা ভূমিকা রাখে।

৭. **নতুন পণ্য উৎপাদন (Production of New Product):** বিদেশে প্রতিষ্ঠিত বড় ধরনের প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের সাথে "গবেষণা ও উন্নয়ন" (R & D) নামে একটি বিভাগ থাকে যার কাজ হলো গবেষণার মাধ্যমে মানুষের চাহিদা মোতাবেক পণ্য ও সেবা উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া। ফলশ্রুতিতে, বাজারে নতুন নতুন পণ্য ও সেবা পাওয়া যায়। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার কাজ হলো- যথাযথভাবে পণ্যটি উৎপাদনের সব ব্যবস্থা করা।

৮. **স্বাগতিক দেশের অর্থনীতি গতিশীল করা (Make Dynamism of the Host Country's Economy):** আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা স্বাগতিক দেশের অর্থনীতি গতিশীল করতে ভূমিকা রাখে। কারণ, একটি প্রতিষ্ঠান চালাতে গেলে বিশাল আকৃতির বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। এ বিনিয়োগ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার দায়িত্ব ব্যবস্থাপনার উপর থাকে। এইভাবে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা স্বাগতিক দেশের অর্থনীতি চাঙা করতে ভূমিকা পালন করে।

৯. **সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার (Proper Utilization of Rsources):** প্রতিষ্ঠানে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা ভূমিকা পালন করে। স্বাগতিক দেশের সম্পদ সরকারের নিকট থেকে ক্রয় করে তা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করা হয়। এতে সরকার ও প্রতিষ্ঠান উভয়ই লাভবান হয়।

১০. **পরিবেশ সংরক্ষণ (Proection of Environment):** বিদেশে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানগুলো আন্তর্জাতিক পরিবেশ সংরক্ষণে কাজ করে থাকে। এ সকল প্রতিষ্ঠান নিজেরা পরিবেশ নষ্ট করে না বরং পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য সিএসআর (CSR) কর্মসূচি থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ সরবরাহ করে থাকে।

সুতরাং বলা যায় যে, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা যেহেতু বিভিন্ন উপায়ে স্বাগতিক দেশ ও বিশ্বের অন্যান্য দেশে ভূমিকা পালন করে, তাই বর্তমান বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা বা ব্যবস্থাপকের কার্যাবলি
Functions of International Management or Manager

যখন একাধিক দেশে বা নিজ দেশের সীমানার বাইরে অন্য দেশে ব্যবসায় পরিচালনা করা হয়, তা-ই আন্তর্জাতিক ব্যবসায়। আর এ ব্যবসায় বা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য যে ব্যবস্থাপনা নিয়োজিত থাকে, তাকে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা বলে। প্রতিষ্ঠানের খরচ সর্বনিম্ন করাও মুনাফা সর্বাধিকরণে ব্যবস্থাপকগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সাধারণ পরিবেশে কাজ করাও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে কাজ করা এক বিষয় নয়। যাহোক, নীচে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা/ব্যবস্থাপকদের কার্যাবলি আলোচনা করা হলো:

১. **পরিকল্পনা (Planning):** আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যবসায় করতে হলে ব্যবস্থাপকদেরকে প্রথমেই ঠিক করতে হবে যে, তারা বাস্তবে কী করতে চায় এবং কীভাবে করতে চায়। এ ক্ষেত্রে ঠিক করতে হবে যে, তারা কি শুধু পণ্য রপ্তানি করবে, নাকি বিদেশে কোনো কোম্পানির সাথে যৌথ ব্যবসায় চালু করবে। তারা অবশ্য বহুজাতিক কোম্পানির মত এক জায়গা থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হলে স্থানীয় (স্বাগতিক দেশ) রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানতে হবে। এ সকল উপাদানের মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক স্থিরতা, সরকারি চাপ, মেধাসত্ত্ব পলিসি, প্রতিযোগিতা প্রভৃতি।

২. **সংগঠন (Organization):** একই ধরনের মান কিংবা সাধারণ কাজ দিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিভিন্ন দেশে ব্যবসায় কার্য পরিচালনা করা সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপকদেরকে সব সময় সকল দেশের স্থানীয় প্রয়োজনের সাথে খাপ খাওয়াতে হবে। প্রথমে তাদেরকে যে সকল কর্মী বিভিন্ন দেশে কোম্পানির হয়ে কাজ করছে, তাদের মধ্যে আদেশের ক্রমপর্যায় বা পদের ক্রমপর্যায় ঠিক করতে হবে। তাউপর যে দেশে কোম্পানিটি কাজ করছে (স্বাগতিক দেশ), সে দেশের আইন-কানুন যুক্ত করতে হবে। সংগঠন প্রতিষ্ঠার সময় স্থানীয় রীতিনীতির বিষয়টি মনে রাখতে হয়। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনায় সাংগঠনিক কাঠামো একটু জটিল হয়। কারণ, এখানে বিভিন্ন দেশের মানুষ কাজ করে। এ সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য সুষ্ঠু ও শক্তিশালী যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকতে হবে। কর্মীরা যেন সবসময় তাদের অভিযোগ, ধারণা, মতামত, পরামর্শ প্রদান করার সুযোগ পায়।

৩. **কর্মীসংস্থান (Staffing):** আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপকদেরকে ঠিক করতে হবে যে, তারা স্বাগতিক দেশ থেকে কর্মী নিয়োগ দেবে নাকি তাদের নিজস্ব কর্মী বিদেশে পাঠাবে। তবে স্থানীয় পর্যায় থেকে কর্মী নিয়োগ দিতে হলে, সেখানকার আইন মেনে তা করতে হবে।

৪. **নির্দেশনা (Directing):** যখন বিভিন্ন দেশের লোক একটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করে, সেখানে নির্দেশনা দেয়া অনেক কঠিন ব্যাপার। কারণ, তাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক পার্থক্য বিদ্যমান থাকে। তারা বিভিন্ন সংস্কৃতি থেকে আসে। তাই ব্যবস্থাপকদেরকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তাদের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে হবে। তাদের সাথে ভাষাগত সমস্যাও হতে পারে। এ সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য ব্যবস্থাপকগণ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন সংস্কৃতির ও জাতির কর্মী নিয়োজিত করতে পারে। মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। তারা এ বিষয়ে কর্মীদেরকে নিয়ে সেমিনারের আয়োজন করতে পারে যাতে তারা বিষয়টি মনে রেখে কাজ করতে পারে।

৫. নিয়ন্ত্রণ (Controlling): পরিদর্শন ও প্রতিবেদন তৈরি- এ দুটি কাজ নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ দিক। কর্মীদের মধ্যে সংস্কৃতিগত পার্থক্য থাকলে নিয়ন্ত্রণের কাজ বাধাগ্রস্থ হয়। সুতরাং ব্যবস্থাপকদেরকে অদ্ভুত সব পরিস্থিতি ও কার্যক্রমের সাথে খাপ খাইয়ে বলতে হবে যাতে নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া সাবলীল হয়। নিয়ন্ত্রণ সফল করতে হলে ব্যবস্থাপকদেরকে তথ্য সরবরাহকারীদের সাথে প্রতিনিয়ত সভা করতে হবে এবং তাদের অবস্থান সম্পর্কে অবগত হতে হবে।

সুতরাং বলা যায় যে, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপকগণ বিশ্ব পরিমণ্ডলে বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত কার্যাবলি সম্পন্ন করে থাকে।

আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা অগ্রগতির কারণ
Causes of Progress of International Management

বর্তমান যুগটি বিশ্বায়নের যুগ। এ যুগে সবকিছুই বিশ্বের আলোকে মূল্যায়ন করতে হবে। তেমনি ব্যবস্থাপনার বিষয়টিকেও বিশ্বোর ব্যবসায় পরিবেশ-পরিস্থিতির আলোকে মূল্যায়ন করতে হবে। দেশের বাহিরে যখন ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি বিস্তার লাভ করে, তাকে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা বলে। অর্থাৎ বিদেশে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান কিংবা দেশে বিদেশী কোনো কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান যেখানে আন্তর্জাতিকভাবে ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়ে থাকে। তাই এটি দিন দিন উন্নত হচ্ছে এবং প্রসার লাভ করছে। যাহোক, নীচে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার অগ্রগতির সম্ভাব্য কারণসমূহ উল্লেখ করা হলো:

১. ব্যবস্থাপনা পেশা হিসাবে স্বীকৃতিলাভ। অর্থাৎ এটি এখন পরিপূর্ণ পেশা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।
২. পণ্য ও সেবার বিশ্বব্যাপী চাহিদা বৃদ্ধি। ফলে বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। সেগুলো পরিচালনার জন্য দক্ষ জনবলের দরকার হয়।
৩. আকর্ষণীয় চাকরির সংস্থান হয়। অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী দক্ষ ব্যবস্থাপকদের চাহিদা বৃদ্ধি পায়।
৪. ব্যবস্থাপকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।
৫. ব্যবস্থাপনার মান উন্নত হয়। বহুজাতিক কোম্পানি বা যে-কোনো বিদেশি কোম্পানিতে চাকরির সুবাদে জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।
৬. কারিগরি দক্ষতার বিকাশ ঘটে।
৭. দক্ষ ব্যবস্থাপনার কারণে বিনিয়োগ ঝুঁকি কমে যায়।
৮. তুলনামূলক সুবিধা অর্জন করা সহজ হয়।
৯. গবেষণা ও উন্নয়ন কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। ফলে নতুন পণ্য ও সেবা এবং কার্য প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন করা সহজ হয়।
১০. প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বাড়ে।
১১. সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং বলা যায় যে, উল্লিখিত কারণে বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা অগ্রগতি লাভ করেছে।

শিক্ষার্থীর কাজ :	শিক্ষার্থীরা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব ও কার্যাবলি সম্পর্কে অ্যাসাইনমেন্ট লিখুন।

সারসংক্ষেপ

‘আন্তর্জাতিক’ শব্দটির অর্থ হলো- দেশের সীমানা পেরিয়ে অন্য কোনো দেশে বা বিশ্ব পরিমণ্ডলে কোনো কিছু ঘটে যাওয়া। আর আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা বলতে ব্যবস্থাপনার ধ্যানধারণা, চিন্তাভাবনা নির্দিষ্ট কোনো দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ব্যাপৃত হওয়া বা প্রয়োগ করার প্রক্রিয়াকে বুঝায়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বহুমুখী সংস্কৃতি বিরাজমান, আন্তর্জাতিক সীমানায় প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যার্জনের জন্য ব্যবস্থাপকগণ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করে থাকে। অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াটি বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি, নৈতিকতা, সামাজিক দায়িত্ব প্রভৃতি উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার কতিপয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়; ১. আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা দেশের বাইরে ভিন্ন পরিবেশে কাজ করে। ২. এটি বিভিন্ন সংস্কৃতি থেকে আসা বিভিন্ন মূল্যবোধে বিশ্বাসী মানুষ নিয়ে কাজ করে। ৩. এটি নিয়ন্ত্রণকারী দেশের আইনকানুন মেনে চলে। ৪. এটি বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উপাদানসমূহ বিবেচনায় রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ৫. এ ব্যবস্থাপনাকে নিয়ন্ত্রণকারী দেশের পরিবেশকে বিবেচনা করে প্রযুক্তি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অনেক। কারণ, এটি পরিবেশ মূল্যায়ন করে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করে। ব্যবসায়িক বাধা কমিয়ে আনে, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করে, নতুন পণ্য উৎপাদন করে, পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখে। তা ছাড়া, ব্যবস্থাপকগণ ব্যবস্থাপনার সাধারণ কার্যাবলি যেমন: পরিকল্পনা, সংগঠন, কর্মিসংস্থান ও নির্দেশনা নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতিকে আন্তর্জাতিকভাবে প্রয়োগ করে থাকে। এতে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জন সহজ হয়।

পাঠ-৬.২ আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের পদ্ধতি; সফলতার উপাদান; আন্তর্জাতিক কৌশল; আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের ঝুঁকি

Methods of Entry into International Market; Success Factors of International Business; lInternational Strategy; Risk of Entering into the Foreign Market

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- সফলতার উপাদান সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- আন্তর্জাতিক কৌশল সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের ঝুঁকির কারণ বলতে পারবেন।

আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের পদ্ধতি

Methods of Entry into International Market

আন্তর্জাতিক ব্যবসায় হলো এমন ব্যবসায় যা দেশের বাইরে সংঘটিত হয়। এ ধরনের ব্যবসায়ের ফলে পণ্য ও সেবা, প্রযুক্তি, ব্যবস্থাপনা জ্ঞান প্রভৃতি এক দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তরিত হয়। ফলে উভয় দেশ উপকৃত হয়ে থাকে। নিয়ন্ত্রক দেশ (host country) ও যে দেশের ব্যবসায় নিয়ন্ত্রক দেশে পরিচালিত হয়, তাকে পৈত্রিক দেশ (Parent Country) বলে। যাহোক, আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের ধরন বা আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের ধরন বিভিন্ন রকম হতে পারে। নীচে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

(১) রপ্তানি (Exporting);
(২) অধিকার চুক্তি বা অনুমতি (Liceneing);
(৩) অধিকার অর্জন বা ফ্রাঞ্চাইজিং (Franchising);
(৪) ব্যবস্থাপনা চুক্তি (Management Contract);
(৫) সহযোগী ব্যবসায় (Subsidiaries);
(৬) আন্তর্জাতিক যৌথ উদ্যোগ (International Joint Venture);
(৭) উৎপাদন চুক্তি (Contract Manufacturing)।

১. রপ্তানি (Exporting): পণ্য বা সেবা উৎপাদন করে বিদেশে বিক্রি করার প্রক্রিয়াকে রপ্তানি বলে। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে এটি একটি সর্বজনবিদিত পদ্ধতি বা উপায়। এ পদ্ধতির বড় সুবিধা হলো এতে যে-কোনো ছোটো প্রতিষ্ঠান অল্প পুঁজি ব্যবহার করে পণ্য বা সেবা রপ্তানি করতে পারে। এতে অতি তাড়াতাড়ি পণ্য বা সেবার মূল্য পাওয়া যায়। প্রতিযোগিতা মোকাবেলা করার জন্য ছোট কোম্পানিগুলো বিদেশে বিক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ জর্ডান টুথব্রাশ একটি ছোট কোম্পানি। এটি নরওয়েতে ফ্যাক্টরি স্থাপন করেছে। এটি একটি মাত্র পণ্য দিয়ে সারা পৃথিবীতে পরিচিতি লাভ করেছে। এটি সম্ভব হয়েছে উত্তম বণ্টনকারী নিয়োগের ফলে।

২. অধিকার চুক্তি বা অনুমতি (Licecning): এটি একটি চুক্তি যার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোনো প্রতিষ্ঠানকে নিজ দেশে পণ্য উৎপাদন বা বিক্রির কিংবা উভয়ের জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়। এ চুক্তির মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পোটেন্ট, ট্রেড মার্ক, প্রযুক্তি প্রভৃতি ব্যবহার করার অধিকার দেওয়া হয়। বিনিময়ে অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট হারে ফি প্রদান করতে হয়। Bartol & Martin বলেন, "অধিকার চুক্তি হলো এমন এক ধরনের চুক্তি যা একটি কোম্পানি অন্য একটি কোম্পানিকে নির্দিষ্ট ফিস বা রয়্যালটির বিনিময়ে সীমিত আকারে এর সম্পদ যেমন: বিশেষজ্ঞ জ্ঞান, পোটেন্ট, কপিরাইট বা যন্ত্র ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করে।" (Licencing is an agreement in which one organization gives

limited right to another to use certain of its assets, such as expertise, patents copyrights or equipment for an agreed upon fee or royalty.)

অনেক খাদ্য তৈরি প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান এ ধরনের অনুমতি প্রদান করে থাকে। উদাহর স্বরূপ Nikeও Disney কোম্পনি পৃথিবীব্যাপী তাদের লাইসেন্স প্রদান করেছে। রপ্তানির মতো লাইসেন্সিংও স্বল্প ঝুঁকিসম্পন্ন কৌশল; কারণ, এতে স্বল্প পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজন হয় এবং এটি সেই সকল দেশে খুব বেশি কার্যকর যেখানে অন্যভাবে অনুপ্রবেশ করা কিংবা মুনাফা স্থানান্তরে অনেক কঠিন নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। লাইসেন্সিং সিস্টেম সবচেয়ে বেশি কার্যকর হয় পণ্যের জীবনচক্রের পূর্ণতা স্তরে যখন প্রতিযোগিতা খুব বেশি।

এছাড়া যে সকল প্রতিষ্ঠানের প্রযুক্তি দ্রুত পরিবর্তনশীল এবং যেখানে বিভিন্ন পণ্যসারি রয়েছে, সেই সকল ক্ষেত্রে লাইসেন্সিং অধিক প্রযোজ্য। রপ্তানিতে যে ট্যারিফ ও কোটা আরোপ করা হয়, এ ক্ষেত্রে তা করা হয় না। তবে এর একটি বড় অসুবিধা হলো- লাইসেন্স গ্রহণকারী ব্যক্তির কার্যক্রম ও কার্যকলাপের উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও লাইসেন্সধারী ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট পণ্য ও সেবা উৎপাদন করতে পারে। যা লাইসেন্স প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

৩. অধিকার অর্জন বা ফ্রাঞ্চাইজিং (Franchising): লাইসেন্সিং এর মতই অধিকার অর্পণে বা ফ্রাঞ্চাইজিং এ ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে কম। লাইসেন্সিং এর মতোই অধিকার অর্পণকারী (Franchisor) তার ট্রেডমার্ক, পণ্য বা সেবা এবং কার্যপরিচালনা নীতি উৎপাদনক্ষমতা ও দক্ষতা গ্রহণকারীকে (Franchise) প্রদান করে থাকে। এর বিনিময়ে অধিকার গ্রহণকারীকে ফিস বা রয়্যালটি প্রদান করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ McDonald এর কথা বলা যায়। এ কোম্পানি নির্দিষ্ট ফিস এর বিনিময়ে এ কাজ করে থাকে। অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান (Franchise) নির্দিষ্ট ফিস দিয়ে McDonald এর সুনাম, বর্তমান খরিদ্দার সুবিধা, বিপণন সুবিধা এবং ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ প্রভৃতি সুবিধা পেতে পারে। অন্যান্য হোটেল ও ফাস্টফুড এর কোম্পানির চেয়ে বড় 'M' বা McDonald এর সুনাম আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। তাই এটি অধিকার অর্পণের মাধ্যমে অন্য প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করতে দিতে পারে। তবে অধিকার অর্পণ ব্যবস্থাপকদেরকে (Franchisor) এটি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি বিষয়ে সমস্যা মোকাবিলা করতে হয়, তা হলো খাবারের মান (Quality) বিস্তর ভৌগলিক পরিসীমায় রক্ষা করা বড়ই কঠিন। অধিকার অর্পণ কৌশলটি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের জন্য খুবই উপযোগী। কারণ, এতে মূলধন খুবই কম লাগে। লাইসেন্সিং এর সাথে ফ্রাঞ্চাইজিং এর দুটি পার্থক্য স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। যেমন: (১) ফ্রাঞ্চাইজিং-এ অন্যান্য বিষয়ের সাথে উৎপাদনের অধিকার ও দক্ষতা অর্পণ করা হয় এবং (২) মূল কোম্পানি যৌক্তিক হারে নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে রাখে।

৪. ব্যবস্থাপনা চুক্তি (Management Contract): এর অর্থ হলো কোনো প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব কোনো কোম্পানি বা ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিকে অর্পণ করা। তারা প্রতিষ্ঠানের কার্যসম্পাদনের জন্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ব্যবস্থাপনা চুক্তিতে বিদেশি কোম্পানিকে প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার অধিকার দেওয়া হয় না। এটি কম ঝুঁকিপূর্ণ একটি অনুপ্রবেশ কৌশল।

৫. সহযোগী ব্যবসায় (Subsidiaries): কোনো দেশ কর্তৃক অন্য দেশে যখন নিজস্ব মালিকানায় ও নিয়ন্ত্রণে কোনো ব্যবসায় গড়ে তোলে, তাকে সহযোগী ব্যবসায় বলে। এ ধরনের ব্যবসায়ের উপর নিয়ন্ত্রক দেশের (Host Country) কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। এক্ষেত্রে মূল দেশ (Parent Country) থেকে মূলধন, প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞান নিয়ন্ত্রক দেশে স্থানান্তরিত হয়। ফলে এ ব্যবসায় থেকে কোনো কিছু হারানোর সম্ভাবনা কম থাকে।

৬. আন্তর্জাতিক যৌথ উদ্যোগ (International Joint Venture): উচ্চ স্তরের বিনিয়োগ এবং ঝুঁকির ক্ষেত্রে যৌথ প্রতিষ্ঠান খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ কৌশলটি ব্যবহার করে যে সুবিধা পাওয়া যায় অন্য কৌশল দিয়ে তা একত্রে কোনো দ্রব্য বা সেবা উৎপন্ন করবে। সাধারণত বহুজাতিক কোম্পানি (MNC) ও স্থানীয় কোম্পানিগুলোর মধ্যে এ ধরনের চুক্তি হয়ে থাকে। তারা আনুপাতিক হারে ইক্যুইটি বহন করে। এ কৌশল ব্যবহার করে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো খুব সহজেই নতুন নতুন বাজারে প্রবেশ করতে পারে। যৌথ প্রতিষ্ঠানের ধারণাটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি

সাধারণ ধারণা। তারা ব্যবসায়িক প্রতিবন্ধকতা দূর করা শক্তিশালী প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান উন্নয়নের জন্য তুলনামূলক অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জন, অতিরিক্ত কাঁচামাল অনুপ্রবেশের নিরাপত্তা প্রদান, কারিগরি ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতা অর্জন এবং বিদেশি পরিবেশে কার্যক্রম পরিচালনার ঝুঁকি ছড়িয়ে দেয়ার উত্তম উপায় হিসাবে কাজ করে। এটি আশ্চর্যজনক নয় যে, অপেক্ষাকৃত বড় প্রতিষ্ঠানগুলি আন্তর্জাতিক যৌথ কোম্পানির (IJV) অধিকাংশ শেয়ারের সাথে সংশ্লিষ্ট, আন্তর্জাতিক শিল্পের সাথে জড়িত এবং স্বাগতিক দেশে (Host Country) এটি কম বিপদজনক ও ঝুঁকিপূর্ণ।

যৌথ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অংশীদারদের মধ্যে মালিকানার স্তর ও অবদান সুনির্দিষ্ট হতে হবে। যৌথ মালিকানায় সফলতা নিশ্চিত করতে হলে অংশীদারদের অবশ্যই ব্যবস্থাপনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করতে হবে। তবে মূল কোম্পানিকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে হবে। অন্যথায় ব্যবস্থাপকগণ প্রত্যাশিত কৌশল বাস্তবায়ন করতে পারবে না। তাই প্রাথমিক অংশীদার নির্বাচন ও পারস্পরিক সুবিধাজনক কার্যচুক্তির উন্নয়ন সফল যৌথ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সত্যিই কষ্টকর।

৭. উৎপাদন চুক্তি (Contract Manufacturing): উৎপাদন চুক্তির অর্থ হলো: উৎপাদনের কাজে সস্তায় শ্রমিকদেরকে দিয়ে কাজ করানো। এতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চূড়ান্ত পণ্য কিংবা কোনো পণ্যের অংশবিশেষ উৎপাদনের জন্য চুক্তি করা হয়। এতে যন্ত্রাংশও সংযোজন (Assemblying) করা হয়। অত:পর এ সকল পণ্য স্বাগতিক দেশেই (host country) বিক্রি করা হয় অথবা মূল প্রতিষ্ঠানের নিজ দেশে (Parent Country) আমদানি করা হয়। ব্যবস্থাপকরা যদি নিশ্চয়তা দিতে পারে, তা হলে স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে বিদেশের বাজারে অনুপ্রবেশের জন্য এটি একটি উত্তম পদ্ধতি। বিখ্যাত Nike কোম্পানি বিশ্বব্যাপী এ ধরনের সিস্টেম ব্যবহার করে থাকে।

আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে সফলতার উপাদানসমূহ

Success Factors of International Business

আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত হলে সাধারণত বহুজাতিক কোম্পানি হিসাবেই আত্মপ্রকাশ করে। যাহোক, আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে সফল হওয়ার অনেকগুলো উপাদান রয়েছে। নীচে এগুলো তুলে ধরা হলো:

১. বহুজাতিক কোম্পানি একটি বড় কোম্পানি হিসাবে বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়িক সুবিধা গ্রহণ করতে পারে। যা ছোটো কোম্পানিগুলো পারে না।
২. সমগ্র পৃথিবীব্যাপী থেকে এ কোম্পানি অর্থসংগ্রহের মাধ্যমে মূলধন বাড়াতে পারে।
৩. সুবিধাজনক কম খরচে ও দক্ষভাবে পণ্য উৎপাদন করতে পারে। কারণ, উৎপাদনের পরিমাণ বেশি।
৪. নিজ দেশের ফার্মে যে সকল প্রাকৃতিক সম্পদ পর্যাপ্ত নাই, সারা পৃথিবী থেকে অতি সহজেই প্রাকৃতিক সম্পদ ও উপাদানসমূহ সংগ্রহ করতে পারে। এটি একটি বড় ধরনের সুবিধা।
৫. বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে দক্ষ ও যোগ্য ব্যবস্থাপক ও কর্মী নিয়োগ করতে পারে বিদেশে ব্যবসারত প্রতিষ্ঠানগুলো।
৬. নিজ দেশে সহজেই মুনাফা স্থানান্তর করা যায়।
৭. ব্যবস্থাপক ও কর্মীদেরকে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা যায়।
৮. দেশ-বিদেশ বেড়ানো যায় এবং ভালো বেতন-ভাতা পাওয়া যায়। সেই সাথে সম্মানও।

উপর্যুক্ত কারণে বিভিন্ন দেশের মেধাবীরা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা পেশায় আগ্রহী হচ্ছে এবং এ সুযোগেই বহুজাতিক কোম্পানিসহ সকল বিদেশি কোম্পানি তাদের গ্রহণ করছে।

আন্তর্জাতিক কৌশল

International Strategy

সাধারণত: বহুজাতিক কোম্পানিগুলো তাদের পণ্য ও সেবা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিক্রি করার জন্য আন্তর্জাতিক কৌশল অবলম্বন করে থাকে। মূল কোম্পানি জ্ঞান, দক্ষতা, কৌশল, প্রযুক্তি প্রভৃতি বিদেশের বাজারে ছড়িয়ে দেওয়া ও সেই সকল স্থানে বা দেশে খাপ খাইয়ে চলার জন্য যে কৌশল অবলম্বন করা হয়, তা-ই আন্তর্জাতিক কৌশল। এ কৌশলের মাধ্যমে স্বাগতিক দেশের ইউনিটকে সংশ্লিষ্ট দেশের কৃষ্টির সাথে খাপ-খাওয়ানোর জন্য মূল দেশ বা প্রধান কার্যালয় থেকে আগত পণ্য ও সেবা এবং ধারণাকে সামান্য পরিবর্তনের সুযোগ দেওয়া হয়। এ কৌশলের মূল লক্ষ্য হলো- মূল কোম্পানির ধারণা, জ্ঞান, সক্ষমতাকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া। এর মূল চালিকাশক্তি বা যোগ্যতাকে কেন্দ্রীভূত করে রাখা হয়।

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে। প্রধান কার্যালয় সাবসিডিয়ারি কোম্পানিগুলোর উপর ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও বাজারজাতকরণ পলিসি নির্ধারণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ রাখে। সমবাজার বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করেই মূল কোম্পানি তার পণ্য, সেবা, জ্ঞান ও প্রযুক্তি অন্য দেশে স্থাপিত কোম্পানি গুলির (সাবসিডিয়ারি কোম্পানি) নিকট ছড়িয়ে দেয়। এছাড়া পণ্যের জীবন উপর ভিত্তি করে উন্নয়ন পর্যায় নির্ধারণ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ- সুইডেনের এরিকসন (Ericssion) কোম্পানি এ কৌশল অবলম্বন করে থাকে। কারণ, সুইডেনের বাজার খুব ছোট যা এ শিল্পের গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মসূচী সমর্থন করে না। তাই এ কোম্পানি আন্তর্জাতিক বাজারে তাদের সক্ষমতা, জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে এবং আবিষ্কৃত পণ্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে এ কৌশল গ্রহণ করে।

যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ বহুজাতিক কোম্পানিগুলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হতে এ কৌশল (আন্তর্জাতিক কৌশল) অনুসরণ করে আসছে। এ কোম্পানিগুলো গবেষণা ও উন্নয়ন (R & D) এবং পণ্য উন্নয়ন কার্যক্রমকে কেন্দ্রীভূত করে উৎপাদন সুবিধা ও বাজারজাতকরণ সংগঠনকে আন্তর্জাতিকীকরণ করে। যাহোক বিভিন্ন দেশের ব্যবসায় বা শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার মাধ্যমে তুলনামূলক সুবিধা লাভের জন্য আন্তর্জাতিক কৌশল নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। সাধারণত বহুজাতিক কোম্পানিগুলো এ ধরনের কৌশল অবলম্বন করে থাকে।

আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের ঝুঁকি

Risk of Entering into the Foreign Market

যে-কোনো প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ করে ব্যবসায় পরিচালনা করতে পারে। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের অনেকগুলো কৌশল বা মোড বা পদ্ধতি রয়েছে। সেগুলো থেকে প্রতিষ্ঠানের জন্য সুবিধাজনক পদ্ধতিটি বাছাই করে নিতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে কতিপয় ঝুঁকিও রয়েছে, যা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। নীচে ঝুঁকি সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

১. অর্থ অনাদায়ের ঝুঁকি (Credit Risk): এর অর্থ 'হলো- বাকিতে পণ্য বিক্রি করার অর্থ অনাদায়ের ঝুঁকি। বাকিতে পণ্য বিক্রিসংক্রান্ত কৌশল গ্রহণের পূর্বে ব্যবস্থাপকদেরকে ভাবতে হবে যে, কীভাবে বাকিতে পণ্য বিক্রির অর্থ আদায় করা যায়। বিশ্বব্যাপী বাজার সম্প্রসারণ করার ক্ষেত্রে এ ধরনের ঝুঁকির উদ্ভব হতে পারে। তবে এর বিপরীতে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। যেমন পণ্য বা মেধা বিক্রির ১০০ ভাগ অর্থ নগদ আদায় করতে হবে। অথবা পণ্য বা সেবার ফরমায়েশ গ্রহণ করার সময়ই প্রশাসনিক ব্যয়ের নামে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ আদায় করে রাখতে হবে এবং বাকিটা পণ্য সরবরাহের সময় রাখতে হবে। এতে মূল্য পরিশোধ না করার ঝুঁকি কমবে।

২. মেধাস্বত্ব ঝুঁকি (Intellectual Property Risk): মেধাস্বত্ব ঝুঁকি বলতে কোম্পানির উদ্ভাবিত পণ্য বা সেবা বা কৌশলগত তথ্য প্রযুক্তি কোনো তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক অনুমোদনবিহীনভাবে ব্যবহার করাকে বুঝায়। এতে প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দেশের বাইরে ব্যবসায় করতে হলে এ ধরনের সমস্যা ব্যবসায় পরিচালনায় বাধার সৃষ্টি করে। তবে কোনো দেশে ব্যবসার চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে প্রতিষ্ঠানের নামে সংশ্লিষ্ট পণ্য বা সেবা বা মেধাস্বত্ব নিবন্ধন করতে হবে। এছাড়াও নকল রোধের জন্য নিজস্ব পণ্যের প্রতিনিয়ত উন্নয়ন সাধন করতে হবে।

৩. বৈদেশিক বিনিময় ঝুঁকি (Foreign Exchange Risk): বিদেশে ব্যবসায় করার ক্ষেত্রে বৈদেশিক বিনিময়ের ঝুঁকি মেকাবিলা করতে হবে। কারণ, মুদ্রার মান আন্তর্জাতিক বাজারে সব সময় একরকম থাকে না। পণ্য বিক্রির চুক্তির সময় মুদ্রার যে হার বিদ্যমান থাকে, পণ্য সরবরাহ করার সময় বা মূল্য পরিশোধের সময় পরিবর্তন হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ক্রেতা বা বিক্রেতা যে কেউ একজন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তাই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে সম্ভাব্য ঝুঁকি বিবেচনা করে "বৈদাশিক বিনিময় হার" নীতি প্রণয়ন করতে হবে।

৪. নৈতিক ঝুঁকি (Ethics Risk): বিদেশী বাজারে পণ্য বা সেবা ছাড়ার ক্ষেত্রে উচ্চমাত্রায় নৈতিকতার মান বজায় রাখতে হবে। কোম্পানির পণ্যের মূল্য সম্পর্কে নানা প্রশ্ন উঠতে পারে। সে কারণে পণ্য উৎপাদন, মূল্য নির্ধারণ, বাজারজাতকরণ প্রভৃতি প্রতিটি পর্যায় সম্পর্কে স্বচ্ছতা থাকতে হবে। প্রতিটি সাবসিডিয়ারি কোম্পানিকে প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করতে হবে এবং এ মর্মে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিশ্চিত করতে হবে।

৫. পণ্য পরিবহণ ঝুঁকি (Shipping Risk): দেশে কিংবা বিদেশে পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে কিছু ঝুঁকি দেখা দিতে পারে, যেমন: পণ্য দূষিত হয়ে যেতে পারে, ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারে, দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, ধ্বংস করে ফেলতে পারে, চুরি হতে

পারে, ভেঙে যেতে পারে ইত্যাদি। তাই এ সকল ঝুঁকির বিপরীতে পর্যাপ্ত বিমা করতে হবে। আন্তর্জাতিক বণিক সভা (International Chamber of Commerce) বৈদেশিক বাণিজ্যে নিয়োজিতদের জন্য কতিপয় নিয়মকানুন প্রণয়ন করেছে যা অবশ্যই সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্কতার জন্য মানতে হবে।

৬. দেশ ও রাজনৈতিক ঝুঁকি (Country & Political Risk): এ ধরনের ঝুঁকির মধ্যে পড়ে- শুল্কহীন বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিনিময় আইন অথবা কোনো দেশের নির্দিষ্ট কিছু পণ্যের বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা প্রভৃতি। কিছু জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ থাকে না, যেমন: মঞ্জুরি। এ জন্য নিজেকে সব সময় প্রস্তুত রাখতে হবে। যে দেশে ব্যবসায় করা হচ্ছে বা পণ্য বা সেবা পাঠানো হচ্ছে, সেখানে কি ধরনের পণ্যসামগ্রীর উপর নিষেধাজ্ঞা আছে, তা জেনে নিতে হবে। তা ছাড়া, রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবশ্যই "রপ্তানি সনদ" (Export Certificate) প্রয়োজন হবে। সংশ্লিষ্ট দেশের সংস্কৃতি, রীতিনীতি, আইন-কানুন ভালোভাবে জেনে নিয়ে ব্যবসায় শুরু করতে হবে।

যাহোক, বৈদেশিক বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে উল্লিখিত বাধাসমূহ বিদ্যমান। তবে নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এগুলো দূর করা বা কমিয়ে আনা খুব সহজ।

শিক্ষার্থীর কাজ :	শিক্ষার্থীরা আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের পদ্ধতি ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের ঝুঁকি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে নিজের জ্ঞান ঝালাই করে নিন।

সারসংক্ষেপ

দেশের সীমানা ছাড়িয়ে অন্য দেশে ব্যবসায় করার প্রক্রিয়াকে আন্তর্জাতিক ব্যবসায় বলে। আন্তর্জাতিক বাজরে প্রবেশ করতে হলে কতকগুলো পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে হবে। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের অনেকগুলো পদ্ধতি রয়েছে। যেমন: পণ্য রপ্তানি, লাইসেন্সিং, অধিকার অর্জন বা ফ্রাঞ্চাইজিং, ব্যবস্থাপনা চুক্তি, সহযোগী ব্যবসায়, আন্তর্জাতিক যৌথ উদ্যোগ প্রভৃতি। আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে সফল হতে হলে স্থান, কাল পাত্রভেদে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যবসায়ের কতিপয় ঝুঁকি রয়েছে; যেমন: অর্থ আদায়ের ঝুঁকি, মেধাস্বত্ব ঝুঁকি, বিনিময় ঝুঁকি, পণ্য পরিবহণ ঝুঁকি ইত্যাদি।

পাঠ-৬.৩ পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনা পরিবেশ কী? ব্যবস্থাপনা পরিবেশের উপর প্রভাবকারী উপাদানসমূহ; আন্তর্জাতিক পরিবেশ কী? আন্তর্জাতিক পরিবেশের উপাদানসমূহ, আন্তর্জাতিক পরিবেশের উপাাদানগুলোর চ্যালেঞ্জসমূহ, একজন ব্যবস্থাপককে কেন ব্যবসায় পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়?

What is Environment & Management Environment; Influencing Factors of Management Environment; What is International Environment?; Elements/Factors of International Environment, Challenges of Elements of International Environment; Why should a Manager be concious about Business Environment?

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনা পরিবেশ এর সংজ্ঞা সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- ব্যবস্থাপনা পরিবেশের উপর প্রভাবকারী উপাদানসমূহ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- আন্তর্জাতিক পরিবেশের উপাদানসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- আন্তর্জাতিক পরিবেশের উপাাদানগুলোর চ্যালেঞ্জসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পরিবেশ কী?

What is Environment?

পরিবেশ হলো পারিপার্শ্বিক অবস্থা যা ঐ বসবাসকারী মানুষ ও অন্যান্য প্রাণিকূলসহ বস্তুর উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। মানুষ যে পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে, বড় হয় ও বসবাস করে, সেই পরিবেশ তার উপর নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে। পরিবেশের অনুকূল বা প্রতিকূল প্রভাবে মানুষ অবশ্যই প্রভাবিত হবে। তাই পরিবেশকে বাদ দিয়ে কোনো কাজ সার্বিকভাবে করা সম্ভব নয়।

Glueek & Lawrence এর মতে, "পরিবেশ হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের বাইরের সেই সকল উপাদানের সমষ্টি যা প্রতিষ্ঠানের জন্য সুযোগ এনে দিতে পারে বা হুমকি হয়েও দেখা দিতে পারে।" (The Environment includes factors outside the firm which can lead to opportunities for or threats to the firm.)

Philip Kotlerএর মতে, "পরিবেশ হলো সমগ্র শক্তি এবং সত্তার সামগ্রিক রূপ যা বাহ্যিক ও সম্ভাবনাময় কোনো নির্দিষ্ট প্রতিনিধির সাথে যথাযথভাবে সম্পর্কিত।" (The environment is the totality of forces and entities that are external and potentiality relevant to the particular agent.)

S. K. Kapoor এর মতে, "পরিবেশ বলতে ব্যবসায় সংগঠনের ও এর কার্যাবলির পারিপার্শ্বিক অবস্থা, উপাদান এবং শক্তিসমূহের সামগ্রিক বিন্যাসকে বুঝায় - যা সংগঠন অথবা ব্যবস্থাপকের কার্যক্রম অথবা সাফল্যকে প্রভাবিত করে।" (Environment means the whole array of conditions, factors and forces surrounding the business organization and job that influence the functioning or success of the organization or manager.)

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে পরিবেশের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, যেমন:

১. পরিবেশ হলো কতকগুলো মিলিত শক্তি বা সত্তার রূপ;
২. শক্তি ও সত্তাগুলো বাহ্যিক দিক থেকে আসে;
৩. কার্যক্রমগুলো অবশ্যই প্রাসঙ্গিক;
৪. পরিবেশ সব সময় মানুষ, জীবজন্তু, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি সকলের উপর প্রতিনিধিত্ব করে;
৫. এটি যে-কোনো উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

সুতরাং বলা যায় যে, পরিবেশ হলো কতকগুলো উপাদানের সমষ্টি যা মানুষ, জীব, জন্তু, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদির উপর প্রভাব বিস্তার করে। এটি মানুষের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

ব্যবস্থাপনা পরিবেশ কী?

What is Management Environment?

ব্যবস্থাপনা পরিবেশ জানার আগে আমাদেরকে জানতে হবে পরিবেশ কী? আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে, তা নিয়েই গঠিত হয় পরিবেশ। যেমন: মানুষ, গাছপালা, পশু-পাখি, ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু ইত্যাদি। এ পরিবেশের মধ্যে থেকেই সকলকে তার নিজস্ব কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হয়। ব্যবস্থাপনার ব্যাপারটিও তাই। পরিবেশের যে সকল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপাদান দ্বারা ব্যবস্থাপনা প্রভাবিত হয়, তাকে ব্যবস্থাপনা পরিবেশ বলে। পরিবেশের অনুকূল ও প্রতিকূল উপাদানসমূহ বিবেচনা করেই ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য, নীতি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রভৃতি কার্যক্রম সম্পাদন করতে হয়। ব্যবস্থাপনার কার্যক্রমও প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক, আন্তর্জাতিক প্রভৃতি পরিবেশের উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়।

Terry & Franklin এর মতে, "ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার প্রয়োগ পরিবেশের উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়।" (The application of the management process are influenced affected by environment factors.)

Mosley ও সহযোগীরা বলেন, "সাংগঠনিক পরিবেশ হলো উপাদানসমূহের সমন্বয় যা সংগঠনের কার্যক্রমের পথকে প্রভাবিত করে।" (Organizational environment is the combination of factors or elements that influence the way of an organization function.)

Martin &H Bartol বলেন, "একটি প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ হলো রূঢ় বাস্তবতা, কতকগুলো মৌলিক অবস্থা যা তাত্ত্বিকভাবে ও সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায়।" (An organizational environment is an objective reality, set of cocrete condition that throretically could be measured perfectly to give managers complete information.)

উপর্যুক্ত আলোচনা হতে ব্যবস্থাপনা পরিবেশের কতিপয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, যেমন:

১. ব্যবস্থাপনা পরিবেশ হলো কতিপয় উপাদানের সমষ্টি।
২. এর অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উপাদান ব্যবস্থাপনার কার্যক্রমে প্রভাব বিস্তার করে।
৩. পরিবেশের উপাদানসমূহ বিবেচনায় না এনে কোনো প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে না।

পরিশেষে বলা যায় যে, যে সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য দিয়ে অভ্যন্তরীণ, বাহ্যিক, আন্তর্জাতিক, সামাজিক প্রভৃতি কোনো প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম প্রভাবিত ও পরিচালিত হয়, তাকে ব্যবস্থাপনা পরিবেশ বলে।

ব্যবস্থাপনা পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান

Influencing Factors of Management Environment

কোনো প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ প্রধানত: চার ধরনের উপাদান দ্বারা প্রভাবিত, যেমন:

১. অভ্যন্তরীণ পরিবেশ (Internal Environment)
২. বাহ্যিক পরিবেশ (External Environment)
৩. কার্য পরিবেশ (Task Environment)
৪. সাধারণ পরিবেশ (General Environment)

নীচে চিত্রের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা পরিবেশের উপাদানসমূহ দেখানো হলো:

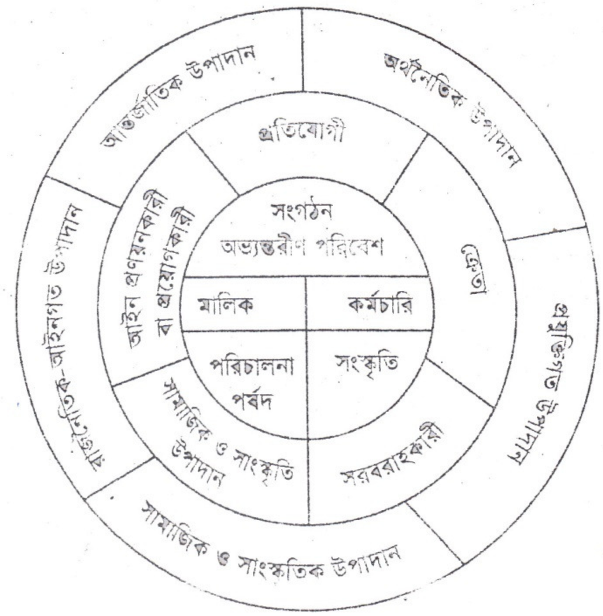

চিত্র ঃ ব্যবস্থাপনা পরিবেশের উপাদানসমূহ।

১. অভ্যন্তরীণ পরিবেশ (Internal Environment): প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে বিদ্যমান পরিস্থিতিকে অভ্যন্তরীণ পরিবেশ বলে। এ পরিবেশের প্রধান উপাদানগুলো হলো মালিক, পরিচালনা পরিষদ, কর্মচারী, প্রতিষ্ঠানের সংস্কৃতি প্রভৃতি।

ক. মালিক বা শেয়ারহোল্ডার (Owner/Shareholders): যে-কোনো প্রতিষ্ঠানেরই মালিকপক্ষ থাকে। তারা ব্যবস্থাপনা বোর্ড বা কর্তৃপক্ষ তৈরি করে। এ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষই মালিক বা শেয়ারহোল্ডারদের প্রতিনিধিত্ব করে। তাই ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে অবশ্যই মালিকপক্ষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে হবে। অর্থাৎ মালিক পক্ষ যেভাবে যা প্রত্যাশা করেন, আইনানুযায়ী সেভাবেই ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।

খ. পরিচালনা পরিষদ (Board of Directors): ব্যবস্থাপনার উপরে পরিচালনা পরিষদ থাকে। তারা মালিকপক্ষের প্রতিনিধিত্ব করেন। অর্থাৎ মালিকদের পক্ষ থেকে কোম্পানি আইন মোতাবেক নির্দিষ্ট সংখ্যক যোগ্যতাসম্পন্ন পরিচালক নিয়ে গঠিত হয় পরিচালনা পরিষদ। তারা কোম্পানির নীতি নির্ধারণ করে থাকে। ব্যবস্থাপনা তা বাস্তবায়ন করে।

গ. শ্রমিক কর্মী (Employees): শ্রমিক-কর্মী ব্যতীত কোনো প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না। তাই শ্রমিক-কর্মীরা হলো অভ্যন্তরীণ পরিবেশের অন্যতম উপাদান। তাই ব্যবস্থাপনাকে তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে কাজ করতে হয়। কারণ, শ্রমিক-কর্মীগণ উচ্চ পর্যায়ে গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে থাকে।

ঘ. প্রতিষ্ঠানের সংস্কৃতি (Organizational Culture): বড় আকারের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব একটি সংস্কৃতি থাকে। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ধারণা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, রীতিনীতি প্রচলিত থাকে। ব্যবস্থাপনা এ সকল রীতি-নীতির বাইরে থেকে কাজ করতে পারে না। অর্থাৎ, ব্যবস্থাপনা এর বাইরে নয়।

২. বাহ্যিক পরিবেশ (External Environment): প্রতিষ্ঠানের বাইরের যে সকল উপাদান প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে প্রভাব বিস্তার করে, তাকে বাহ্যিক পরিবেশ বলে। বাহ্যিক পরিবেশের উপাদানসমূহ নীচে আলোচনা করা হলো:

ক. প্রতিযোগী (Competitors): কথায় আছে, Survival of the fittest। কোম্পানিকে বাজারে টিকে থাকতে হলে প্রতিযোগিতা মোকাবিলা করার কৌশল আয়ত্ত করতে হয়। প্রতিযোগীদের তুলনায় ভালো পণ্য উৎপাদন করে ক্রেতা সন্তুষ্টি অর্জন করা যে-কোনো উৎপাদকেরই প্রধান লক্ষ্য। এ সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনীক্ষমতা কাজে লাগিয়ে

প্রতিযোগীদের থেকে ভালো পণ্য উৎপাদন ও তুলনামূলক কম দামে সরবরাহ করতে হবে। আর প্রতিযোগিতায় টিকে থাকলেই মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি করা সহজ হবে।

খ. সরবরাহকারী (Suppliers): কোম্পানির কাঁচামালের প্রয়োজন হয়, সে কারণে পূর্ব থেকেই সরবরাহকারী ঠিক করা থাকে। তারা কোম্পানির সেবা ও পণ্য উৎপাদনের জন্য কাঁচামালের যোগান দিয়ে থাকে। কাঁচামালের যোগান যথাসময়ে ও সঠিক দামে পাওয়া না গেলে কোম্পানিকে বিশেষ সমস্যায় পড়তে হয়। এ জন্য সরবরাহকারীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা আবশ্যক। তা না হলে কাঁচামাল সরবরাহে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে। ফলে উৎপাদন ব্যাহত হবে।

গ. মধ্যস্থ ব্যবসায়ী (Middleman): মধ্যস্থ ব্যবসায়ী হলেন ঐ সব ব্যক্তি যারা উৎপাদনকারীর নিকট থেকে উৎপাদিত পণ্য বা সেবা চূড়ান্ত ভোক্তার নিকট পৌছে দেয়। মধ্যস্থ ব্যবসায়ী বা পাইকার, খুচরা বিক্রেতা, কমিশন এজেন্টগণ ক্রেতার সন্ধানে উৎপাদনকারীকে সহায়তা করেন এবং তাদের উৎপাদিত পণ্য ক্রেতাদের নিকট সরবরাহ করেন। তাদের সাথে যোগাযোগ ও ভালো সম্পর্ক না থাকলে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানকে উৎপাদিত পণ্য বা সেবা নিয়ে ঝামেলা পোহাতে হয়। মধ্যস্থ ব্যবসায়ীগণ সেবা প্রদানকারী প্রতিনিধি হিসাবেও কাজ করে। তারা অনেক ক্ষেত্রে অর্থসংস্থান ও আর্থিক লেনদেনে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানিকে সহায়তা করেন।

ঘ. ক্রেতা (Buyers): ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ক্রেতা সাধারণকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে কার্যক্রম পরিচালনা করে, যেমন: (১) ভোক্তার বাজার, (২) শিল্প বাজার, (৩) পাইকারী ও খুচরা বাজার, (৪) জনসেবার স্বার্থে গঠিত সরকারি বাজার এবং (৫) জনসাধারণ। এরা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ও বিক্রয় কাজের একটি সহায়ক উপাদান বা পরিবেশ হিসাবে ভূমিকা পালন করে।

ঙ. জনসাধারণ (People): জনসাধারণ বলতে কোনো দল বা গোষ্ঠীকে বোঝায় যারা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে অংশ নিতে আগ্রহী। এ দল বা গোষ্ঠীকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন: (১) ব্যাংক বা লগ্নি প্রতিষ্ঠান যারা অর্থসংস্থানে সহায়তা করেন (২) গণমাধ্যম যারা বিভিন্ন তথ্য প্রচার করে থাকে (৩) ভোক্তা সংগঠন (৪) পরিবেশ সংগঠন (৫) সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ইত্যাদি। জনসাধারণের মনোভাবকে লক্ষ্য রেখেই উৎপাদককে তার পণ্য বা সেবা উৎপাদন করতে হয়।

চ. জনসংখ্যা পরিবেশ (Demographic Environment): উদ্যোক্তাকে প্রথম যে বিষয়টি বিবেচনা করতে হয় তা হলো বাজার এবং চাহিদা। বাজার ও চাহিদা নির্ভর করে জনসংখ্যার উপর। জনসংখ্যা বেশি হলে চাহিদা বৃদ্ধি পায়। আর জনসংখ্যা কম হলে বাজার সীমিত হয়ে পড়ে, চাহিদা কমে যায়। ব্যবসায়ী যে পণ্য বা সেবা উৎপাদন করবে তার চাহিদা কেমন হবে বা এর বাজার কতা বিস্তৃত হবে সে বিষয়টি বিবেচনা করা জরুরি। জনসংখ্যা বিশ্লেষণ করে পণ্যের বাজার ও চাহিদা জানতে হবে।

ছ. অর্থনৈতিক পরিবেশ (Economic Environment): বাজারে লোকজনের সংখ্যার সাথে সাথে তাদের আয়ের অবস্থা তথা ক্রয়ক্ষমতাও থাকতে হবে। অর্থনৈতিক পরিবেশ বিশ্লেষণ করে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা যাচাই করা যায়। ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতা যাচাই করতে হলে আরও কতিপয় বিষয় সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে হবে। যেমন: আয় পরিস্থিতি, মুদ্রাস্ফীতির হার, সঞ্চয় প্রবণতা, ভোগের জন্য ব্যয়ের হার প্রভৃতি। তা ছাড়া পণ্য ক্রয়ের উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এসব বিষয় বিবেচনা করেই একজন ব্যবসায়ীকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

জ. প্রাকৃতিক পরিবেশ (Natural Environment): একটি দেশের জলবায়ু, ভৌগলিক অবস্থা, প্রাকৃতিক সম্পদ, আবহাওয়া, নদ-নদী ইত্যাদি নিয়েই তার প্রাকৃতিক পরিবেশ গঠিত। প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর কাঁচামালের যোগান, ভোগের ধরন, জীবনযাত্রার প্রকৃতি ইত্যাদি নির্ভর করে। আবার বর্তমান সময়ে পরিবেশবাদী ধারণা বিকাশের ফলে ব্যবসায়ীকে এমন ব্যবসায়ে লিপ্ত হতে হবে যেন পরিবেশ দূষিত না হয়। এসব বিষয়ও ব্যবসায়ীকে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।

ঝ. প্রযুক্তিগত পরিবেশ (Technological Environment): প্রযুক্তিগত বিদ্যার বিকাশের ফলে মানুষের জীবনের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। একই সাথে নতুন পণ্যের চাহিদাও সৃষ্টি হয়েছে। তাই উদ্যোক্তাকে প্রযুক্তিগত পরিবেশ সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে যে, বর্তমানে বাজারে কী ধরনের প্রযুক্তি চালু আছে তার প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান কী ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করে ইত্যাদি। তাকে এটিও জানতে হবে যে, কোনো প্রযুক্তিতে পণ্য উৎপাদন করলে খরচ কম লাগে এবং বাজারের চাহিদা মোতাবেক কম দামে পণ্য সরবরাহ করা যাবে। অত:পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

ঞ. রাজনৈতিক পরিবেশ (Political Environemnt): একটি দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ ব্যবসায়ের উপর দারুনভাবে প্রভাব ফেলে। দেশে যদি গণতান্ত্রিক অবস্থা বিরাজ করে তাহলে অনেকক্ষেত্রেই তা ব্যবসায়ের জন্য অনুকূল হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ভোক্তা ও ব্যবসায়ীদের অধিকার সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের আইন প্রচলিত থাকে, যা ব্যবসায় বিকাশের জন্য সহায়ক। তবে রাজনীতিকদের সাথে ব্যবসায়ীদের একটি সুসম্পর্ক গড়ে উঠা ও বজায় থাকা জরুরি। তবে গণতন্ত্র থাকলেও সুশাসন যদি না থাকে, তাহলে দুর্নীতি, আমলাতন্ত্র ব্যবসায় বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তা ছাড়া সন্ত্রাস দমন ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি না হলে ব্যবসায় বিকশিত হয় না।

ট. সাংস্কৃতিক পরিবেশ (Cultural Environment): একজন মানুষ যে পরিবেশে বড় হয় সে সমাজের প্রচলিত বিশ্বাস, রীতিনীতি, মূল্যবোধ তার আচরণকে প্রভাবিত করে। এই জন্য এমন কোনো ব্যবসায়ের উদ্যোগ নেওয়া যাবে না, যা মানুষের প্রচলিত বিশ্বাসের বিপরীত। এ ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে। সুতরাং কোনো উদ্যোগ নেওয়ার পূর্বে সাংস্কৃতিক পরিবেশের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, ব্যবসায় পরিবেশের আওতায় অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উপাদানগুলো ব্যবসায়ীকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। এ বিবেচনা যত সূক্ষ্ম হবে ব্যবসায়ের সাফল্য তত নিশ্চিত হবে।

আন্তর্জাতিক পরিবেশ কী?

What is International Environment?

বর্তমান সময়ে ব্যবসায়-বাণিজ্য এতাই সম্প্রসারিত হয়েছে যে, এটি আর নিজ দেশে সীমাবদ্ধ নাই। মোটকথা বৈদেশিক ব্যবসায় ব্যতীত কোনো দেশ একমুহূর্তেও চলতে পারে না। আর বৈদাশিক ব্যবসায় করতে হলে আন্তর্জাতিক পরিবেশ সম্পর্কে অবশ্যই জ্ঞানার্জন করতে হবে। পরিবেশ বা এর উপাদান সম্পর্কে ধারণা অর্জনের কোনো বিকল্প নাই। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক, প্রযুক্তিগত, আইনগত প্রভৃতি অবস্থা এবং সেই সাথে আন্তর্জাতিকভাবে ব্যবসায় বড় প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবসায়িক অবস্থাকে আন্তর্জাতিক পরিবেশ বলে। বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন সংস্থা, সমিতি, চুক্তি বিদ্যমান, যা এড়িয়ে যাওয়া আন্তর্জাতিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশের রেডিমেড গার্মেন্টস ব্যবসায়ীরা বিদেশে তাদের পণ্য রপ্তানি করে থাকে। তাই এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাজার, প্রতিযোগিতার অবস্থা, পরিবেশগত উপাদান প্রভৃতি সম্পর্কে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদেরকে অবশ্যই তথ্য সংগ্রহ ও বিচারবিশ্লেষণ করে দেখতে হবে এবং সার্বক্ষণিকভাবে নজর রাখতে হবে। সুতরাং যে পরিবেশ বা সেবা আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে, তাকে আন্তর্জাতিক পরিবেশ বলে।

আন্তর্জাতিক পরিবেশের উপাদান

Elements/Factors of International Environment

আন্তর্জাতিক ব্যবসায় তথ্য প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল। আবার বিশ্বায়ন তথ্য প্রযুক্তিকে বেগবান করেছে। তাই ব্যবসায় যেমন একদিকে সহজ হয়েছে, অন্যদিকে এটি জটিলতর ও প্রতিযোগিতামূলক হয়ে ওঠেছে। তাই আন্তর্জাতিক পরিবেশের উপাদানসমূহ তুলে ধরা হলো:

১. বিশ্ব-অর্থনৈতিক পরিবেশ (World Economic Environment): বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিবেশ বলতে বুঝায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রচলিত মুদ্রামানের অবস্থা, অর্থের প্রচার, রিজার্ভের পরিমাণ, মূলধনে অর্থের সরবরাহ, বিনিময় হার, লেনদেনের অবস্থা প্রভৃতিকে বুঝায়। বিশ্বে বিদ্যমান বিভিন্ন জোট বা আঞ্চলিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অর্থের সরবরাহ, অর্থনৈতিক অবস্থা ও পরিবেশের উপাদান হিসাবে কাজ করে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থাকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে জি-৯ গঠন করা হয়েছে। আবার, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক অবস্থার উপর দরিদ্র দেশগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থা কে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সার্ক (SAARC) গঠন করা হয়েছে। যাইহোক, বিশ্বের ধনী দেশগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থার উপর দরিদ্র দেশগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থা নির্ভর করে। একবার যুক্তরাষ্ট্রসহ কয়েকটি দেশের কোম্পানিগুলো মালয়েশিয়া থেকে বিনিয়োগ প্রত্যাহার করায় পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো দারুণ অর্থ সংকটে পতিত হয়েছেন। আবার, বিশ্ব বাজারে তেলের দাম বৃদ্ধি পেলে সারা বিশ্বে তার প্রভাব পড়ে। সুতরাং বিশ্ব অর্থনৈতিক অবস্থা আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে প্রভাব বিস্তার করে।

২. **বিশ্ব আইনগত পরিবেশ (Global Legal Environment):** বিশ্ব আইনগত পরিবেশ হলো বিশ্বের সকল দেশের জন্য সমভাবে অনুসরণীয় প্রচলিত কিছু আইনগত অবস্থা। উদাহরণস্বরূপ সন্ত্রাস দমনসংক্রান্ত বিধি, পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, আন্তর্জাতিক বিচার আইন, শিশুশ্রম বন্ধের আইন, আন্তর্জাতিক সীমানা প্রভৃতি বিশ্বের সকল দেশকে মেনে চলতে হয়। সুতরাং ব্যবসায় করতে হলে এগুলো বিবেচনা করেই আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

৩. **আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিবেশ (International Political Environment):** বিশ্বের বড় বড় দেশগুলোর রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্বের অন্যান্য দেশের উপর প্রভাব বিস্তার করে, এটিই রাজনৈতিক পরিবেশ। বিশ্বের বড় দেশগুলো তাদের রাজনৈতিক প্রভাব বলয় দ্বারা ছোটো দেশগুলোকে প্রভাবিত বা আজ্ঞাবহ করতে সক্ষম হয়। ফলে তারা যে সকল শর্তারোপ করছে, তা ছোটো দেশগুলো মেনে নিয়ে তাদের স্ব স্ব দেশের নীতি নির্ধারণ করছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশকে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে জিএসপি (GSP-Generalised System of Preference) সুবিধা দিচ্ছে। এতে বাংলাদেশের রপ্তানিকারকরা সে সকল দেশে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাচ্ছে। এতে বাংলাদেশের রপ্তানিকারকরা সে সকল দেশে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাচ্ছে। আবার অন্যান্য দেশ সহজশর্তে ঋণ দিচ্ছে। এ সবই রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে হচ্ছে। সুতরাং ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিবেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে কাজ করে।

৪. **আন্তর্জাতিক প্রযুক্তিগত পরিবেশ (International Technological Environment):** সারা বিশ্বে কি ধরনের প্রযুক্তির প্রচলন রয়েছে, তা নিজ দেশে চালু করতে হবে, অন্যথায় বিশ্বের উন্নত প্রযুক্তির দেশগুলোর সাথে কম উন্নত দেশগুলো টিকে থাকতে পারবে না। আধুনিক প্রযুক্তির উদ্ভাবনের ফলে উন্নত দেশগুলো উন্নতই থেকে যাচ্ছে, আর পিছিয়ে পড়ছে অনুন্নত দেশগুলো। উদাহরণস্বরূপ বর্তমানে তথ্যই হচ্ছে শক্তি। সেই তথ্য প্রযুক্তি (IT) তে উন্নত দেশগুলো যেভাবে ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নয়ন করছে, বাংলাদেশে সেভাবে পারছে না। সাম্প্রতিকভাবে অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপনের মাধ্যমে উন্নত বিশ্বের সাথে সংযুক্ত হওয়ার প্রয়াস চালানো হচ্ছে। মোদ্দাকথা হলো, বিশ্বে যে ধরনের প্রযুক্তি চালু আছে, নিজ দেশে সে ধরনের প্রযুক্তি চালু করতে হবে। অন্যথায়, উন্নয়নের অংশীদার হওয়া যাবে না।

৫. **আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক পরিবেশ (International Cultural Environment):** আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যবসায় করতে হলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রচলিত সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। সংস্কৃতি হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা রীতি-নীতি যা সংশ্লিষ্ট দেশের জনগণ বিশ্বাস করে ও মেনে চলে। অতএব সংশ্লিষ্ট দেশের সংস্কৃতিকে এড়িয়ে ব্যবসায় পরিচালনা করা সম্ভব নয়। সুতরাং বিশ্বমানের ব্যবসায় ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করতে হলে বিদেশী সংস্কৃতিকে বিবেচনা করতেই হবে। উদাহরস্বরূপ বহুজাতিক কোম্পানিগুলো যখন অন্য দেশে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে, তখন তারা সে দেশের প্রচলিত সংস্কৃতির সাথে মিল রেখেই তা পরিচালনা করে।

৬. **আন্তর্জাতিক ব্যবসায় পরিবেশ (International Business Environment):** আন্তর্জাতিক ব্যবসায় পরিবেশ বলতে বিশ্বে প্রচলিত ব্যবসায় সংক্রান্ত আইন-কানুন ও বিধি-বিধানকে বুঝায়। যেমনঃ আমদানি-রপ্তানি আইন, ব্যবসায় সংক্রান্ত চুক্তি, শুল্ক আইন, ভ্যাট আইন প্রভৃতি। আন্তর্জাতিক ব্যবসায় পরিচালনা করতে হলে এগুলো বিবেচনায় রাখতে হবে। প্রতিটি দেশের চেম্বার অব কমার্স সংশ্লিষ্ট দেশের ব্যবসায়ীদেরকে এ ব্যাপারে ওয়াকিবহাল করে থাকে। বর্তমানে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) সারা বিশ্বে ব্যবসায়িক আইনকানুন নিয়ে কাজ করছে এবং বিভিন্ন দেশের সাথে দরকষাকষির মাধ্যমে মীমাংসা করার চেষ্টা করছে। তবে তা ধনী দেশগুলোর পক্ষেই বেশির ভাগ।

পরিশেষে বলা যায় যে, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পরিবেশের উক্ত উপাদানগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই এগুলোকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করে ব্যবসায় পরিচালনা করা আবশ্যক।

আন্তর্জাতিক পরিবেশের উপাদানগুলোর চ্যালেঞ্জসমূহ

Challenges of Elements of International Environment

বর্তমান যুগ হলো বিশ্বায়নের যুগ। এ যুগে সর্বত্র তীব্র প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। এ প্রতিযোগিতা মোকাবিলা করতে হবে। তা না হলে বাজারে টিকে থাকা যাবে না। প্রতিযোগিতা মোকাবিলা করতে হলে আন্তর্জাতিক পরিবেশের উপাদানগুলোর যে চ্যালেঞ্জ রয়েছে তা চিহ্নিত করতে হবে এবং সে মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নীচে এ চ্যালেঞ্জসমূহ আলোচনা করা হলো:

১. **বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিবেশের চ্যালেঞ্জসমূহ (Challenges of Global Economic Environment):** বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিবেশের উপাদান হলো অর্থনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়; যেমন: চাহিদা, সরবরাহ, উৎপাদন, বণ্টন, প্রাকৃতিক সম্পদ, আয়, বিনিয়োগ, সঞ্চয়, মূলধন প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিবেশে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে এবং তা বিনিয়োগ, উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থাসমূহ হলো:

ক. বিশ্বব্যাপী ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির ব্যবস্থার প্রবর্তন;
খ. বিশ্বায়নের প্রভাবে বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠানের বিলোপসাধান;
গ. কৃষির পরিবর্তে শিল্পনির্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তন;
ঘ. ধনী দেশগুলো যৌথভাবে বিশ্বব্যাপী পুঁজি বিনিয়োগ করছে; ফলে দেশীয় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।
ঙ. অপেক্ষাকৃত দুর্বল অর্থনীতির দেশগুলোর অর্থনীতি দূরাবস্থায় পতিত হচ্ছে।

২. **বিশ্ব ব্যবসায় পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ (Challenges of Elements of Global Business Environment):** বিশ্বায়ন তথা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) প্রভাবে বিশ্বব্যাপী ব্যবসায় পরিবেশের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কারণ, এতে প্রতিটি দেশ অবাধে বিশ্বের যে-কোনো দেশে যে-কোনো সময় পুঁজি বিনিয়োগ করতে পারে। ফলে বিশ্বব্যাপী অবাধে পুঁজি চলাচলে গতি সৃষ্টি হয়েছে, কাঁচামাল আমদানি-রপ্তানিতে বাঁধা অপসারিত হয়েছে। এতে বড় দেশের বড় প্রতিষ্ঠানগুলো পুঁজি, কাঁচামাল প্রভৃতি অবাধ চলাচলের সুবিধা নিচ্ছে। ফলে ক্ষুদ্র দেশগুলোর শিল্পপ্রতিষ্ঠান বিলীন হওয়ার উপক্রম হয়েছে। এইভাবে আন্তর্জাতিক ব্যবসায় পরিবেশ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে।

৩. **বিশ্ব প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ (Global Technological Challenge):** উন্নত বিশ্ব সব সময়ই প্রযুক্তির দিক থেকে উন্নত। উন্নত দেশগুলো তাই উৎপাদন, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি থেকে শুরু করে সব কাজেই উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। কিন্তু অনুন্নত দেশগুলো বিভিন্ন কারণে এ প্রযুক্তির পথে নিজেদেরকে খাপ খাওয়াতে পারে না। ফলে বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছে না। কারণ, এ সকল দেশের মূলধন, দক্ষ জনশক্তি, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ প্রভৃতির অভাব রয়েছে। সুতরাং অনুন্নত দেশগুলোর জন্য এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

৪. **বিশ্ব আইনগত পরিবেশ (Global Legal Environment):** ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আইনগত পরিবেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন আইন ও নিজ দেশের বিভিন্ন আইনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। নতুবা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা ও টিকিয়ে রাখা কষ্টকর হবে। যে-কোনো ব্যবসায় ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিবেশগত দিক বিবেচনা করতে হবে। অর্থাৎ এমন কোনো শিল্প বা ব্যবসায় স্থাপন ও পরিচালনা করা যাবে না, যা পরিবেশের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ, শিশুশ্রম রোধ, পণ্যের আন্তর্জাতিক মান সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। অনুন্নত দেশের পক্ষে অনেক সময় এ সকল আইন মেনে চলা সম্ভব হয় না।

৫. **বিশ্ব রাজনৈতিক পরিবেশ (Global Political Environment):** বিশ্বরাজনৈতিক দিক-দর্শন ব্যবসায় ও শিল্পের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে কাজ করে। উন্নত দেশগুলো তাদের নিজস্ব ধ্যানধারণা দরিদ্র দেশগুলোর উপর চাপিয়ে দিতে চায়। ফলে সংশ্লিষ্ট দেশগুলো চাপের মুখে পতিত হয়। অনেক সময় তাদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়, যা পরবর্তীকালে অসুবিধার সৃষ্টি করে। বিশেষ করে দেশের বিনিয়োগের উপর রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের প্রভাব পড়ে। তাই এটিও ব্যবসায় ও শিল্পের ক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

৬. **বিশ্ব সাংস্কৃতিক পরিবেশ (Global Cultural Environment):** সংস্কৃতি হলো মানুষের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যগত ব্যাপার। দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে সহজে মুছে ফেলা যায় না। কিন্তু স্যাটেলাইট প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে দেশের সংস্কৃতিকে পাশ কাটিয়ে বিদেশি সংস্কৃতিকে অনুসরণ করা মোটেই সুখকর নয়। এতে মানুষের চিন্তাভাবনা, চলন-বলন, আচার-আচরণ, পছন্দ-অপছন্দ প্রভৃতি প্রভাবিত হয়। আর তখনই বিপত্তি ঘটে। সুতরাং ব্যবসায় শিল্পকে গ্রহণের ক্ষেত্রে এ বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, আন্তর্জাতিক পরিবেশের উপর্যুক্ত উপাদানগুলো যে-কোনো দেশের ব্যবসায় ও শিল্পের জন্য চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। কারণ, এগুলো যে-কোনো দেশের ব্যবসায় ও শিল্পের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

একজন ব্যবস্থাপককে কেন ব্যবসায় পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়?

Why should a Manager be concious about Business Environment?

মানুষ কিংবা প্রতিষ্ঠান কোনোটিই পরিবেশের বাইরে নয়। তাই প্রতিষ্ঠানকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য পরিবেশগত উপাদান সম্পর্কে একজন ব্যবস্থাপককে সদা সতর্ক থাকতে হয়। কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপককে দুধরনের পরিবেশগত উপাদান বিবেচনায় আনতে হয়, যেমন: অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশগত উপাদান। যাহোক নীচে উল্লেখিত কারণে একজন ব্যবস্থাপককে পরিবেশ সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হয়-

১. **সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার (Mamixmum Utilization of Resources):** সম্পদের যথাযথ ও সর্বোচ্চ ব্যবহারের উপরই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জন নির্ভর করে। আবার সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার নির্ভর করে পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর। তাই সব ধরনের সুযোগ কে কাজে লাগিয়ে সম্পদকে ব্যবহার করত প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জনের জন্য ব্যবস্থাপককে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।

২. **সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Taking Right Decision):** সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর প্রতিষ্ঠানের সফলতা নির্ভর করে। আর ব্যবস্থাপক যত দক্ষ হবে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ তত সঠিক হবে। তবে যে-কোনো বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে ব্যবস্থাপককে পরিবেশের উপাদান তথা পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করতে হবে।

৩. **দুর্বলতা দূরীকরণ (Removing Weakness):**ব্যবস্থাপককে তার প্রতিষ্ঠানের সম্ভাব্য দুর্বলতা ও শক্তিসমূহ চিহ্নিত করতে হবে। অত:পর দুর্বলতাসমূহ দূর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এইজন্য ব্যবসায় পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।

৪. **পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানো (Adapting with Changing Situation):** পরিবেশ পরিস্থিতি সব সময়ই পরিবর্তনশীল। তাই বাজারে টিকে থাকার জন্য পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে চলতে হবে। এ জন্য পরিবেশের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উপাদান সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।

সুতরাং বলা যায় যে, একজন ব্যবস্থাপককে সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। আর সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে সব সময় সঠিক ধারণার্জন করতে হবে। সুতরাং একজন ব্যবস্থাপককে ব্যবসায় পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ :	শিক্ষার্থীগণ আন্তর্জাতিক পরিবেশেরউপাদানসমূহ ও চ্যালেঞ্জসমূহ খাতায় লিখবেন।

সারসংক্ষেপ

পরিবেশ হলো পারিপার্শ্বিক অবস্থা যা বসবাসকারী মানুষ ও অন্যান্য প্রাণিকূলসহ বস্তুর উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। মানুষ যে পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে, বড় হয় ও বসবাস করে, সেই পরিবেশ তার উপর নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে। আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে, তা নিয়েই গঠিত হয় পরিবেশ। যেমনঃ মানুষ, গাছপালা, পশুপাখি, ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু ইত্যাদি। এ পরিবেশের মধ্যে থেকেই সকলকে তার নিজস্ব কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হয়। ব্যবস্থাপনার ব্যাপারটিও তাই। পরিবেশের যে সকল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপাদান দ্বারা ব্যবস্থাপনা প্রভাবিত হয়, তাকে ব্যবস্থাপনা পরিবেশ বলে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক, প্রযুক্তিগত, আইনগত প্রভৃতি অবস্থা এবং সেই সাথে আন্তর্জাতিকভাবে ব্যবসায় বড় প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবসায়িক অবস্থাকে আন্তর্জাতিক পরিবেশ বলে। বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন সংস্থা, সমিতি, চুক্তি বিদ্যমান, যা এড়িয়ে যাওয়া আন্তর্জাতিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক পরিবেশের উপাদানগুলো হলোঃ বিশ্ব-অর্থনৈতিক পরিবেশ, বিশ্ব আইনগত পরিবেশ, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিবেশ, আন্তর্জাতিক প্রযুক্তিগত পরিবেশ, আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও আন্তর্জাতিক ব্যবসায় পরিবেশ। একজন ব্যবস্থাপককে নানা কারণে ব্যবসায় পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়। যেমনঃ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দুর্বলতা দূরীকরণ, পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানো প্রভৃতি।

পাঠ-৬.৪

আন্তর্জাতিক ব্যবসায় সংগঠন হিসাবে বহুজাতিক কোম্পানি; বহুজাতিক ব্যবসায়ের পরিবর্তন: দেশকেন্দ্রিক থেকে বিশ্বকেন্দ্রিক পরিচিতি; বহুজাতিক কোম্পানির সুবিধা-অসুবিধা

International Business Organization : Multinational Corporations (MNCS); Transformation of MNCs : Ethnocentric to Geocentric Orientation; Advantages & Disadvantages of MNCs Countries

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আন্তর্জাতিক ব্যবসায় সংগঠন হিসাবে বহুজাতিক কোম্পানি সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- বহুজাতিক ব্যবসায়ের পরিবর্তন সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- বহুজাতিক কোম্পানির সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

আন্তর্জাতিক ব্যবসায় সংগঠন : বহুজাতিক কোম্পানি

International Business Organization : Multinational Corporations (MNCS)

যে-সকল কোম্পানির নিজ দেশে প্রধান কার্যালয় থাকে এবং অন্য দেশে উক্ত কোম্পানির শাখা অফিস ও সাবসিডিয়ারি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা হয়, তাকে বহুজাতিক কোম্পানি বলে। এ ধরনের কোম্পানির বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শাখা অফিস থাকতে পারে। এ কোম্পানির ক্ষেত্রে আর্থিক পলিসি নির্ধারণের ক্ষমতা প্রধান কার্যালয়ের উপর ন্যস্ত থাকে। এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন: ব্যবস্থাপনা স্টাইল নির্ধারণ, স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন, স্থানীয় কৃষ্টি বিবেচনা করা প্রভৃতি বিষয়ে সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠানকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ- ইউনিলিভার ও ফিলিপস কোম্পানি। Franklin Root-এর মতে, বহুজাতিক কোম্পানিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সংজ্ঞায়িত করা যায়। যেমন: মালিকানা, কৌশল ও কাঠামো।

১. **মালিকানার দৃষ্টিকোণ থেকে:** একটি ফার্ম তখনই বহুজাতিক হয় যখন দুই বা ততোধিক দেশের নাগরিক প্রধান কার্যালয় বা প্রধান কোম্পানির মালিক হয়। যেমন: শেল ও ইউনিলিভার কোম্পানি ব্রিটিশ ও ডাচ নাগরিক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়।

২. **ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিতে:** একটি আন্তর্জাতিক কোম্পানি তখনই বহুজাতিক কোম্পানি হবে যখন এর ব্যবস্থাপকরা বিভিন্ন দেশের নাগরিক হবে। এর ব্যবসায় কৌশল হবে- বৈশ্বিকভাবে মুনাফা সর্বাধিকরণ।

Weihrich ও তার সহযোগীদের মতে, "যে-সকল কোম্পানির প্রধান কার্যালয় নিজ দেশে বা যেকোনো এক দেশে কিন্তু এর কার্যক্রম পরিচালিত হয় বিভিন্ন দেশে তাদেরকে বহুজাতিক করপোরেশন বলে।" (Multinational Corporation (MNCS) have their headquarters in one country but operate in many countries.)

Bartol & Martin এর মতে, "বহুজাতিক কোম্পানি হলো এমন কোম্পানি যা নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে উৎপাদন বা সেবা কার্যক্রমের সাথে জড়িত, ঐ প্রতিষ্ঠানের পলিসি নিয়ন্ত্রণ করে এবং বৈশ্বিক পরিস্থিতি মোতাবেক ব্যবস্থাপনা কার্য চালায়।" (An organization that engages in production or service activities through its own affiliates in several countries, maintains control over the policies of those affiliates, and manges from a global perspective.)

সুতরাং বলা যায় যে, বহুজাতিক কোম্পানি হলো সেই সকল কোম্পানি যা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সহযোগী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করত: উৎপাদন ও সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে, আর্থিক ও পলিসি নির্ধারণের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে রাখে এবং বিভিন্ন দেশের জনগণের রুচি, পছন্দ, চাহিদা, আর্থিক সামর্থ্য, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে কৌশল নির্ধারণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করে।

বহুজাতিক ব্যবসায়ের পরিবর্তন : দেশকেন্দ্রিক থেকে বিশ্বকেন্দ্রিক পরিচিতি

Transformation of MNCs : Ethnocentric to Geocentric Orientation

পরিবেশ পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সাথে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো বিভিন্ন দর্শনে বিশ্বাস করে এবং তদনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনার প্রয়াস পায়। বিশেষ করে বহুজাতিক কোম্পানির ব্যবস্থাপকরা তিন ধরনের দর্শনে বিশ্বাস করে এগুলি হলো:

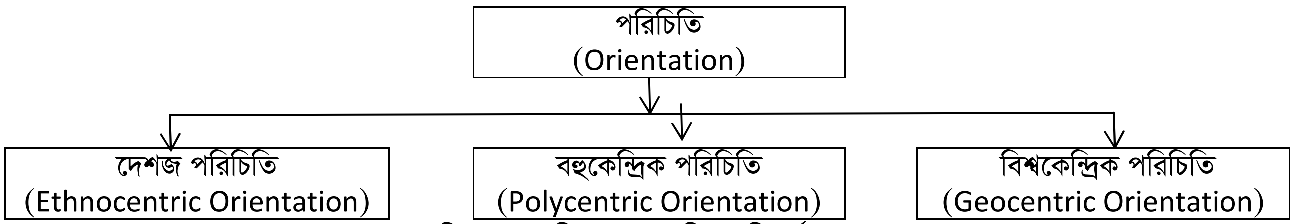

চিত্রঃ বহুজাতিক কোম্পানির পরিবর্তন

১. **দেশজ পরিচিতি (Ethnocentric Orientation):** এ ক্ষেত্রে নিজ দেশ (Home Country) ও নিয়ন্ত্রিত দেশ (Host Country) সম্পর্কে ধারণার্জন করতে হবে। নিজ দেশ বলতে সে-ই দেশকে বুঝায় যেখানে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কার্যালয় অবস্থিত। আর নিয়ন্ত্রিত দেশ (Host Country) বলতে বিদেশকে বুঝায়, যেখানে প্রতিষ্ঠানটি ব্যবসায় পরিচালনা করে। আর দেশজ পরিচিতি হলো বিদেশে স্থাপিত বহুজাতিক কোম্পানিতে নিজ দেশের ধ্যান-ধারণা নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করা। অর্থাৎ এটি আন্তর্জাতিক ব্যবসায় এক ধরনের অ্যাপ্রোচ যাতে নির্বাহীরা মনে করে যে, প্রধান কার্যালয়ে যে ধরনের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় তা বিশ্বের অন্যত্রও করা উচিত। কিন্তু নির্বাহীদের ধারণাটি ভুল। এটি সর্বত্র সমভাবে কার্যকর হয় না। উদাহরণস্বরূপ- জাপানে ১৯৭৩ থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত Procter & Gamble কোম্পানির উৎপাদিত সাবান বাজারজাতকরণে ব্যর্থ হয়েছিল। কারণ, তারা জাপানের স্থানীয় বিশ্বাসকে (Beliefs) বিবেচনা করেনি। অনেক গবেষণার পর এর কারণ, উদঘাটিত হয় এবং কিছতা সফল হয়।

২. **বহুকেন্দ্রিক পরিচিতি (Polycentric Orientation):** এটিকে নিয়ন্ত্রিত দেশকেন্দ্রিক পরিচিতিও বলা যায়। এক্ষেত্রে নির্বাহীরা বিশ্বাস করে যে, বিশ্বের যে দেশে প্রতিষ্ঠানটির অবস্থান তা পরিচালনার জন্য যতদূর সম্ভব সেই সম্পর্কে তারাই ভালো জানে। ফলে তারা কোম্পানিটি ভালোভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম হয় এবং এইভাবে তারা মূল কোম্পানির সাথে শুধু আর্থিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আবদ্ধ থেকে স্বাধীনভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করে থাকে।

৩. **বিশ্বকেন্দ্রিক পরিচিতি (Geocentric Orientation):** এটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার একটি দিক যেখানে নির্বাহীরা বিশ্বাস করে যে, মূল কোম্পানির প্রধান কার্যালয় ও অন্যান্য দেশে অবস্থিত সাবসিডিয়ারি কোম্পানিগুলির বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন এবং এ ধারণার আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিকে সমস্যা মোকাবিলা করা আবশ্যক। বিশ্বকেন্দ্রিক পরিস্থিতিতে বিবেচনাযোগ্য বিষয়গুলো হলো- কোম্পানিটি বিশ্বের কোথায় অর্থ উপার্জন করতে পারবে, কোথায় যন্ত্রপাতি বা কারখানা স্থাপন করতে হবে, কোথায় গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং কীভাবে নতুন ধারণা ও পণ্য সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য উদ্ভাবন করবে। তবে বিশ্বকেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনায় একটি সমস্যা হলে এটিকে কার্যকর করতে হলে ব্যবস্থাপকদেরকে স্থানীয় ও বিশ্ব সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানার্জন করতে হবে। এ ধরনের অ্যাপ্রোচকে অঞ্চলকেন্দ্রিক পরিচিতিও বলা হয়। এতে যে দেশে সাবসিডিয়ারি কোম্পানিটি অবস্থিত, তার পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ব্যবস্থাপক ও কর্মী নিয়োগ করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে বাটা সু কোম্পানি, নোভার্টিজ ওষুধ কোম্পানি একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

বহুজাতিক কোম্পানির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ

Advantages & Disadvantages of MNCs Countries

বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর সুবিধাগুলো নিম্নরূপ:

১. বিদেশ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করা সহজ হয়।
২. বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ নিয়োগ দেওয়া যায়।
৩. বিদেশি প্রতিষ্ঠানের মুনাফা, রয়্যালটি, লাইসেন্স ফিস প্রভৃতির মাধ্যমে আয় প্রবাহ বৃদ্ধি পায়।

৪. বিদেশে চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হয়।

বহুজাতিক কোম্পানির অসুবিধাসমূহ নিম্নরূপ:

১. নিয়ন্ত্রিত দেশ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বা সার্বভৌমত্ব হারাতে পারে। কারণ, বহুজাতিক কোম্পানির সকল কাজ সরকারে পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না।

২. নিয়ন্ত্রিত দেশের নিজের উপর অনেক ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রণ থাকে না। কারণ, বহুজাতিক কোম্পানিগুলি বিশ্ব পরিস্থিতির আলোকে কার্যক্রম পরিচালনা করে। ফলে কিছু কাজের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকে না যেমন: বহুজাতিক কোম্পানিগুলো কাঁচামাল আমদানি করে কিংবা তহবিল স্থানান্তর করে, তখন ব্যয় পরিশোধ পরিকল্পনায় প্রতিকূল প্রভাব সৃষ্টি হয়।

৩. বহুজাতিক কোম্পানিগুলি স্থানীয় শ্রমিক-কর্মীদের উচ্চ হারে মজুরি ও বেতন দিয়ে থাকে। ফলে সরকারকে শ্রমিকদেরকে উচ্চ মজুরি দিতে হয়।

৪. কিছু অর্থনৈতিক ইস্যু যেমন: উচ্চ সুদের হার, মূলধন ঘাটতি, রপ্তানিতে বাঁধা, মুনাফা পিতৃদেশে প্রেরণে বাধা প্রভৃতি বহুজাতিক কোম্পানির কাজে বাঁধার সৃষ্টি করে।

৫. বিভিন্ন দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্যের কারণে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর ব্যবস্থাপকদের সমস্যা মোকাবিলা করতে হয়। এমনকি তাদের পরিবারবর্গও সমস্যায় পড়ে। ভাষাগত পার্থক্য, শারীরিক গঠন ও জনগণের মূল্যবোধ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ও মানবিক দিকে বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে পারে।

৬. বহুজাতিক কোম্পানির একটি বড় সমস্যা হলো- নিয়ন্ত্রিত দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য বিনষ্ট হয়। কোম্পানিগুলো তাদের নিজস্ব পোষাক, খাদ্য প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত দেশে প্রচলন করার চেষ্টা করে। ফলে সে দেশের যুবকরা তা গ্রহণ করে নিজ দেশের ঐতিহ্য ভুলে যায়।

সুতরাং বলা যায় যে, বহুজাতিক কোম্পানির সুবিধা-অসুবিধা দুদিকই রয়েছে। তথাপি দেশে বহুজাতিক কোম্পানির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এতে দেশের বেকার সমস্যা লাঘব হয়, বিনিয়োগ বাড়ে এবং অর্থনীতিতে এর অনুকূল প্রভাব পড়ে।

শিক্ষার্থীর কাজ :	শিক্ষার্থীরা বহুজাতিক কোম্পানির সংজ্ঞা, সুবিধা ও অসুবিধা এবং এর পরিবর্তন সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে আলোচনাপূর্বক জ্ঞান ঝালাই করে নিন।

সারসংক্ষেপ

যে সকল কোম্পানির নিজ দেশে প্রধান কার্যালয় থাকে এবং অন্য দেশে উক্ত কোম্পানির শাখা অফিস ও সাবসিডিয়ারি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা হয়, তাকে বহুজাতিক কোম্পানি বলে। এ ধরনের কোম্পানির বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শাখা অফিস থাকতে পারে। এ কোম্পানির ক্ষেত্রে আর্থিক পলিসি নির্ধারণের ক্ষমতা প্রধান কার্যালয়ের উপর ন্যস্ত থাকে। এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন: ব্যবস্থাপনা স্টাইল নির্ধারণ, স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন, স্থানীয় কৃষ্টি বিবেচনা করা প্রভৃতি বিষয়ে সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠানকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হয়। বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর সুবিধাগুলো হলো: বিদেশ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করা সহজ হয়, বিশ্ববাজারে প্রতিযোগীতার মাধ্যমে প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ নিয়োগ দেওয়া যায়, বিদেশি প্রতিষ্ঠানের মুনাফা, রয়্যালটি, লাইসেন্স ফিস প্রভৃতির মাধ্যমে আয় প্রবাহ বৃদ্ধি পায় এবং বিদেশে চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হয়। বহুজাতিক কোম্পানির অসুবিধাসমূহ হলো: অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বা সার্বভৌমত্ব হারাতে পারে, বহুজাতিক কোম্পানির সকল কাজ সরকারে পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না, নিয়ন্ত্রিত দেশের নিজের উপর অনেক ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রণ থাকে না। কিছু অর্থনৈতিক ইস্যু যেমন: উচ্চ সুদের হার, মূলধন ঘাটতি, রপ্তানিতে বাধা, মুনাফা পিতৃদেশে প্রেরণে বাঁধা প্রভৃতি বহুজাতিক কোম্পানির কাজে বাঁধার সৃষ্টি করে।

পাঠ-৬.৫

বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির কেস স্টাডি; বাংলাদেশে পেশা হিসাবে ব্যবস্থাপনার আত্মপ্রকাশ

Case Study on Management System of MNCs, Management as a profession in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বহুজাতিক কোম্পানির সফলতার কাহিনি বলতে পারবেন;
- বহুজাতিক কোম্পানিতে অনুসরণকৃত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- বাংলাদেশে ব্যবস্থাপনা পেশার বিকাশ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির কেস স্টাডি

Case Study on Management System of MNCs

কেস-০১ : ফ্রেড ডেনি (Fred Denny)

ব্যবস্থাপনা অধ্যয়ন ও প্রয়োগ করাটাই হলো সমস্যা। ফ্রেড ডেনি, মহাকাশ পদার্থবিদ (Space Physicist) তার ল্যাবরেটরি প্রধান ক্রেড গ্রিনউড (Greenwood) কে বলেছিলেন যে, ব্যবস্থাপনায় কোনো বিজ্ঞানের ভিত্তি নাই। আমি অনুভব করি, আমি জানি আমি কি করছি, যখন আমি মিসাইল এর পরিচালন সিস্টেম নকশা করি। কারণ, আমার নিকট মহাকাশ, প্রচলন শক্তি ও অন্যান্য বিজ্ঞান আছে। তারা আমাকে বলে দেয় যে, কি করতে হবে। কিন্তু যখন আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে, আমি আমার প্রকৌশল ও কারিগরি দলের সাথে ভালো তত্ত্বাবধায়কের কাজ করছি, সেখানে কোনো বিজ্ঞান নাই, ব্যবস্থাপনায় কোনো বিজ্ঞান নাই আমাকে পথ-নির্দেশনা দেয়ার জন্য। ব্যবস্থাপনার উপর বই পড়ে আমি ধারণা পেয়েছি যে, ব্যবস্থাপককে সবসময়, অন্তরঙ্গ পদ্ধতির ভিত্তিতে (Closed system basis) কাজ করতে হবে; অর্থাৎ, ব্যবস্থাপককে অধীনস্থদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ হতে হবে, প্রতিটি ক্ষুদ্র বিষয়েও তাদের সাথে পরামর্শ করতে হবে এবং কঠোর নিয়ম ও প্রক্রিয়া চালু করতে হবে যাতে অধীনস্তরা ভুল না করতে পারে। "আমি এটি সম্পর্কে ভেবেছি, ক্লড আমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তেমন বিজ্ঞান দেখতে পাই না এবং আমি আশ্চর্য হই যে, কত সুন্দর ব্যবস্থাপনার বই, আর্টিক্যালস এবং ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের উপর কোর্সসমূহ আমাদের জন্য এ পর্যন্ত কিছুই করতে পারেনি। আমাদেরকে কি শতবর্ষ অপেক্ষা করতে হবে যখন ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞান সত্যিকারের পদার্থবিজ্ঞান হিসাবে উন্নত হবে?" ক্লড গ্রিনউড (Cloude Greenwood)বহুসংখ্যক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন বিষয়ক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন যা ব্যবস্থাপনা জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহারের উপর জোর দেয়, ফ্রেড (Fred) তা বিরক্ত ও রাগান্বিত হয়ে এসকল প্রত্যাখান করেন। কিন্তু তিনি খুবই সন্তুষ্ট যে, তার অধীনস্থরা কী বলেন, সেগুলোর অনেক অর্থ বহন করে। তিনি (Cloude) চিন্তিত যে, ফ্রেড (Fred) কে কি জবাব দেবেন।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে:

১. যদি আপনি লড গ্রিনউড হতেন, কীভাবে আপনি ফ্রেড ডেনি এর বক্তব্যের জবাব দিতেন?

২. ব্যবস্থাপনাকে অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত করতে আপনার মতামত কী?

আইবিএম- এ ব্যবস্থাপনার ধরন

Patterns of Management at IBM

থমাস জে. ওয়াটসন জুনিয়র (Thomas J. Watson) এর পিতা ১৯২০ ও ১৯৩০ সালের দিকে একজন বিখ্যাত শিল্পপতি ছিলেন। তিনি আইবিএম কে পাঞ্চকার্ড এর ব্যবসায়ের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। ওয়াটসন জুনিয়র আইবিএমকে কম্পিউটার ব্যবসায়ে নিয়ে গেলেন এবং বড় বড় প্রতিযোগীদের বিপরীতে প্রবৃদ্ধি অর্জনের ভিশন ঠিক করে দেন। বিখ্যাত প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে- জেনারেল ইলেকট্রিক, আর, সিএ (RCA), হানি ওয়েল (Honey well) এবং রেমিংটন র‌্যান্ড (Remington Rand)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আইবিএম বেড়ে ওঠে কারণ, তখন পাঞ্চ কার্ড ব্যবহারের মাধ্যমে হিসাবরক্ষণ যন্ত্রের ব্যাপক চাহিদার সৃষ্টি হয়। কিন্তু ১৯৫০ এর মাঝামাঝি সময়ে গণনাশক্তি সম্পন্ন কম্পিউটার মানুষের

নিকট ততা আগ্রহের বিষয় থাকে না। আইবিএম কে সফল করার পিছনে কারিগরি উদ্ভাবন নয়, বিপণন ও সেবাই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। কম্পিউটার জগতের শুরুতে হার্ডওয়্যার সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রতিযোগীরা সমানে সমান ছিল। কিন্তু অনেক প্রতিযোগী পড়ে যায় যখন যন্ত্রাংশ (equipment) স্থাপন ও সার্ভিসিং এর প্রয়োজন হয়। শুরুর দিকে কম্পিউটার তৈরি হতো ইলেকট্রিক টিউব দিয়ে। এগুলো চালাতে লোকবল কম ছিল। এ প্রয়োজন মেটাতে আইবিএম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতা গ্রহণ করলেন। এতে নতুন পেশার সৃষ্টি হলো, যেমনঃ প্রোগ্রামার, সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি। ১৯৫৪ সালের দিকে আইবিএম এর প্রকৌশলীদের বিরোধিতার বিপরীতে যেয়ে ওয়াটসন জোর দিলেন টিউবের পরিবর্তে ট্রানজিস্টর দিয়ে কম্পিউটার তৈরি করতে।

ওয়াটসন এ ব্যাপারে সফল হলেন। কারণ, তিনি ভালো কর্মী নিয়োগ দিলেন, তাদেরকে দিয়ে কার্যদল তৈরি করলেন এবং আর্থিক সুবিধা প্রদান করলেন, তাদের সাথে যুক্ত হলেন এবং মুক্ত যোগাযোগ চ্যানেল স্থাপন করলেন। ব্যক্তিগত যোগাযোগ বা সম্পর্কের পরিবর্তে যোগ্যতাকে ভিত্তি করে কর্মী নিয়োগ করা হলো। আইবিএম এর আর একটি পলিসি ছিল- চাকরির নিরাপত্তা। এ পলিসি মহামন্দাকে পেছনে ফেলে দিল। শুধু ব্যবস্থাপক নয়, কর্মীদেরকেও ভালো বেতন দেওয়া হতো। ১৯৫৫ সালে শুরু হয় এমন এক সুবিধা কর্মীদেরকে কোম্পানির স্টক শেয়ার ক্রয়ের সুযোগ দেয় এবং তা অনেককেই ধনীতে রূপান্তর করে। ওয়াটসন কোম্পানিতে জাপানের সংস্কৃতি চালু করেন। বিক্রয়কর্মীকে শক্ত কলার ওয়ালা সাদা শার্ট পড়তে হয়। সেখানে কোম্পানির একটি গানও ছিল। কিন্তু ওয়াটসন জুনিয়র রীতিনীতি শিথিল করেন। বৃদ্ধ কিংবা যুবক সকলের নিকট ওয়াটসন ছিলেন যথার্থ লোক (Perfectionist)। সকলকে সমান গুরুত্ব দিয়ে শুনতেন। তাদের অন্তর্নিহিত নীতি ছিল মানুষকে মূল্যায়ন করা, ক্রেতা সন্তুষ্টি অর্জন এবং সঠিক জিনিস করতে পথ চলা।

প্রশিক্ষণেরও প্রয়োজন হতো। ১৯৫০ এর দিকে ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ছিল প্রাচীন ধরনের। ১৯৬৬ সালে নিয়ম চালু করা হয় যে, মানুষকে কীভাবে পরিচালনা করতে হয় তার জন্য ব্যবস্থাপনা স্কুলে ভর্তি হতে হবে। এতে প্রথম কর্মসূচি ছিল হার্ভার্ড এর কেস পদ্ধতি ভিত্তিক। কর্পোরেট সংস্কৃতির আর একটি পদক্ষেপ ছিল খোলা দরজা পলিসি (Open door policy) নীতি চালু করা। এতে কর্মীরা তাদের সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপকের সাথে আলোচনার পর উচ্চ পর্যায়ে যেতে পারতো। বস্তুত ওয়াটসন তার মোট সময়ের ১/৫ ভাগ সময় কর্মীদের সাথে কথা বলে কাটাতেন; তিনি খোলা দরজায় হাটাহাটি করতেন। এ নীতির কারণে খোলা যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু হয় এবং উচ্চ ব্যবস্থাপনা কর্মীদের থেকে দূরে থেকে যে সমস্যা সৃষ্টি করতো, তার সমাধান এভাবে দেওয়া হতো।

আর একটি কর্পোরেট সংস্কৃতি চালু করা যায়, তা হলো- Piecework পদ্ধতি রহিত করা। এতে হোয়াইট কলার ও ব্লু কলার কর্মীদের মধ্যে পার্থক্য দূর হয়। ১৯৫০ এর শেষ দিকে কর্মীরা বেতনের সাথে চিকিৎসা ও অন্যান্য সুবিধা গ্রহণ করে। কোম্পানি কর্মীদেরকে স্কুল ও চ্যারিটিতে অংশগ্রহণের জন্য বিশেষ গ্রান্টস প্রদান করে। এতে ব্যবস্থাপক ও অব্যবস্থাপকদের মধ্যে পার্থক্য কমে আসে। আইবিএম খুবই সফল একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। কিন্তু ১৯৮৯ এর শেষ দিকে কোম্পানি ঘোষণা দেয় যে, বাজার পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য এটি পুনর্গঠন করা হবে এবং ১০,০০০ পদ কমিয়ে দেওয়া হবে। ১৯৯১ সালে আইবিএম সিইও (CEO) আকারস (Akers) অতিরিক্ত পুনর্গঠনের ঘোষণা দেয়।

শিক্ষার্থীদের জন্য:

১. কোন্ কোন্ উপাদান আইবিএম কে সফল করে?
২. অতীতের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি আজকের জন্য ফলপ্রসূ কিনা? কেন বা কেন নয়?
৩. আপনি কি মনে করেন যে বাজারের পরিবর্তনশীল অবস্থা আইবিএম এর অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনবে?

ইউনিলিভারঃ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এমএনসি'র মধ্যে একটি

Unilever: One of the world's Largest MNC

বলা হয় যে, ইউনিলিভারের সূর্য কখনো অস্ত যায় না। কোম্পানিটির ৩০০,০০০ এর বেশি সংখ্যক কর্মী ৭০ টি দেশে ৫০০ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। যদিও এর ব্যবসায়িক নাম "ইউনিলিভার" কিন্তু এর সকল গৃহস্থালি পণ্যের নাম। আমেরিকাতে যে-সকল পণ্য চালু আছে, সেগুলোর নাম হলো- লিপটন, ডোভ, ক্যারেজ, উইস্ক, পেপসোডেন্ট, বাস্কো

স্প্যাজেটি সস, পন্ডস ফেস ক্রিম ও ক্যালভিন ক্রিন প্রসাধনী। এতো মাত্র কয়েকটি নাম। ইউনিলিভার হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কোম্পানিগুলির মধ্যে একটি, যা পৃথিবীর মোট খাদ্য বাজারে শতকরা একভাগ এবং শতকরা ১০ ভাগ পারসোনাল প্রোডাক্ট মার্কেটে শেয়ার রয়েছে।

ইউনিলিভারে আশ্চর্যজনক বিষয় হলো- এটি দ্বৈত কাঠামোতে (Dual Sructure) চলে। মূলত এটি দুটি কোম্পানি রয়েছে; দুটি প্রধান কার্যালয় এবং দুই সেট শেয়ারহোল্ডার রয়েছে। ইউনিলিভার পাবলিক লিঃ হলো লন্ডনভিত্তিক এবং ইউনিলিভার এনভি (Naamloze Venuootschap) এর অর্থ হলো সীমিত দায় কোম্পানি; এটি রটারডাম ভিত্তিক। ১৯৩০ সালে এ কোম্পানি দুটো একত্রিত করা হয় (merger)। শেয়ারহোল্ডারগণ সম্পূর্ণ কোম্পানিটির লভ্যাংশই ভোগ করেন এবং তা সমহারে। কে কোন্ কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার সেটি বড় বিষয় নয়। ইউনিলিভার একটি "বিশেষ কমিটি" (Special Committee) দ্বারা পরিচালিত হয়। এ কমিটিতে দুই কোম্পানি থেকে দুইজন চেয়ারম্যান থাকেন। ইউনিলিভার পাবলিক লি. কোম্পানি থেকে আসেন এবং NV থেকেও একজন চেয়ারম্যান হন এবং তৃতীয় আরেকজন সিনিয়র পরিচালক। উচ্চ পর্যায়ের সব সিদ্ধান্ত এ কমিটি কর্তৃক গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়াও আরও পনেরো জন পরিচালক রয়েছেন যারা সরাসরি এ কমিটিকে রিপোর্ট করে থাকেন। প্রতিটি কোম্পানি থেকে অনেক ধরনের পণ্য সমন্বয়কারী নিয়োগ দেওয়া হয় যারা পৃথিবীব্যাপী পণ্য কৌশল উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকে।

কোম্পানি বহুকেন্দ্রিক নীতি (Polycentric) অনুসরণ করে। এর অর্থ হলো- ব্যবস্থাপনা জাতীয়করণ, যেখানে বিভিন্ন দেশের স্থানীয় ব্যবস্থাপক উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়। এ বিশ্বাসের উপর পলিসিটি গ্রহণ করা হয় যে, এ ব্যবস্থাপকগণ স্থানীয় চাহিদা বিদেশি ব্যবস্থাপকদের চেয়ে ভালো বুঝবে।

ইউনিলিভারে এ দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ৫ বৎসর থেকে ৩ বৎসর মেয়াদি করা হয়েছে। কারণ, বিশ্ব পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তনশীল। তাই ব্যবসায় সমন্বয়কারীগণ ৩ বছরের পরিকল্পনা প্রণয়ন করে জমা দিতে পারে, যেখানে থাকবে- সম্ভাব্য বিক্রয়, জনবলের সংখ্যা, প্রত্যাশিত নগদ প্রবাহ এবং মুনাফা বৃদ্ধির জন্য কী কী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে, তার বিবরণ। অত:পর এ পরিকল্পনা বিশেষ কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত বা সংশোধিত হয়ে থাকে।

যতদূর সম্ভব ইউনিলিভার সারা বিশ্বে একই ধরনের পণ্য বিক্রি করতে চায়। এ ক্ষেত্রে 'লাক্স সাবান' হলো উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এটি বাংলাদেশে যেমন, সৌদি আরব কিংবা যুক্তরাষ্ট্রেও তেমনই। অন্যান্য পণ্য যেমন: সানসিল্ক শ্যাম্পু, বডি স্প্রে ইম্পালসও বিভিন্ন দেশে বিক্রি হয়। এ দুটো কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটু পরিবর্তন হয়। খাদ্যসামগ্রী সারা বিশ্বে একই রকম।

আমেরিকাতে ইউনিলিভারের ৫টি আলাদা বিভাগ রয়েছে, যেমন: (i) লিভার ব্রাদার্স (সাবান ও লন্ড্রি পণ্য), (ii) ইউনিলিভার পার্সোনাল কেয়ার আইটেমস ও কসমেটিক্স (iii) থমাস জে. লিপটন (চা, শুকনো সোপ ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী) (iv) ভ্যানডেন বার্গার ফুডস (মার্গারিন ও এডিবল ফ্যাটস) এবং (v) রাগো ফুডস (স্প্যাজেটি সস)। কার্যক্রমের আলোকে এ প্রতিষ্ঠানগুলো যথাযথ প্রোডাক্ট কো-অর্ডিনেটরের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করে থাকে।

ইউনিলিভার হলো বিশ্বের অনেকগুলি কোম্পানির মধ্যে একটি, যা আমাদের জীবনকে ছুঁয়ে গেছে। অন্যান্য কোম্পানির নামও বলা যায়- যেগুলো আমাদের নিকট দৃশ্যমান, যেমন: Fiat, Honda, Volvo, Michelin, Nestle, Sony, NEC, Toyota ও Volks wagon। অনেক বিশেষজ্ঞ বলে থাকেন যে, প্রতিষ্ঠানগুলোকে ক্রমবর্ধমান চাহিদা জন্য বিশ্বভিত্তিক পরিকল্পনা প্রয়োজন এবং সে মোতাবেক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। সারা বিশ্বকে তাদের বাজার ধরে রেখে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে সেই সকল স্থানে, যেখানে প্রতিষ্ঠানের জন্য লক্ষ্যার্জন করা সহজ হবে। বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, বিশ্বব্যাপী দৃষ্টি দেওয়া এখন সময়ের দাবি। কারণ, বাজারে অনেক প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান বিরাজ করছে। যেমন: অটোমোবাইল, ব্যাংকিং, ইলেকট্রনিক্স সেবাখাত, ফার্মাসিউটিক্যালস, পাবলিশিং, ভ্রমণসেবা ও ওয়াশিং মেশিন প্রভৃতি।

ব্যবস্থাপকগণ শুধু আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের কাজেই ব্যস্ত নয়, তাদেরকে আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগিতাও মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এ থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার যে, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকদের প্রচুর জ্ঞান থাকতে হবে। শুধু তাই নয়, ব্যবস্থাপকদেরকে আন্তর্জাতিক পরিবেশ, আন্তর্জাতিক তুলনামূলক সুবিধা এবং নতুন কিছু উদ্ভাবনের সাথে এর

সম্পর্ক ইত্যাদি সম্পর্কে বিশদ জ্ঞানার্জন করতে হবে। এ ছাড়াও বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি ও নৈতিকতার বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় রাখতে হবে।

শিক্ষার্থীদের জন্য:

১. ইউনিলিভার কোম্পানির পরিচয় তুলে ধরুন।
২. ইউনিলিভার কোম্পানি লি:. এর সফলতার কারণ, বর্ণনা করুন।
৩. এ কোম্পানি বিশ্ববাজারে ব্যবসায় পরিচালনা করছে এর ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করুন।
৪. আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যবসায় পরিচালনায় ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে?

বাংলাদেশে পেশা হিসাবে ব্যবস্থাপনার প্রকাশ

The exposure of Management as A Profession in Bangladesh

ব্যবস্থাপনা একটি পেশা কিনা, সে সম্পর্কে যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। এ সম্পর্কে মন্তব্য করার পূর্বে পেশা কী, পেশার বৈশিষ্ট্য কী তা জানতে হবে। পেশা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, "পেশা হলো বিশেষায়িত জ্ঞান, যা অন্যদেরকে নির্দেশনা, পরামর্শ বা উপদেশ দানের ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য অর্জন করা হয়। এ সংজ্ঞার আলোকে ব্যবস্থাপনাকে পেশা বলা যায় কিনা? অথবা, ব্যবস্থাপকরা অন্যান্য পেশাজীবি যেমন: ডাক্তার, প্রকৌশলী, আইনজীবীদের মতো বিশেষায়িত জ্ঞানের অধিকারী কিনা? এ সকল দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা হলে ব্যবস্থাপনা পেশা কিনা সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। Mary Parket Follet অবশ্য তার এক গবেষণায় ব্যবস্থাপনাকে পেশা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন যে, ব্যবস্থাপনা পেশাজীবীগণ নিজেরাই নিজেদেরকে তৈরি করবে। কারণ, তারা সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে যাচ্ছে। এ দায়িত্ব পালনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সুশৃঙ্খল জ্ঞানের প্রয়োজন। আর ব্যবস্থাপনার অর্থ হলো বিশেষায়িত জ্ঞান যা শিক্ষার মাধ্যমে অর্জন করতে হয় যেমনটা করতে হয় ডাক্তার ও প্রকৌশলীর ক্ষেত্রে। এ দিক থেকে ব্যবস্থাপনাকে একটি পেশা হিসাবে গণ্য করা যায়। ষাটের দশক থেকে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিশেষায়িত জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। ব্যবস্থাপনাকে পেশা হিসাবে বিবেচনার জন্য কতিপয় বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করতে হয়, সেগুলো হলো:

১. **দক্ষতা (Skill):** ব্যবস্থাপনা পেশায় ব্যবস্থাপনাবিদদেরকে বিশেষায়িত জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এ বিষয়ে তাদেরকে দক্ষ হতে হবে।
২. **সুসংবদ্ধ জ্ঞান (Body of Knowledge):** যে দক্ষতা অর্জন করতে হবে, তা সুসংবদ্ধ জ্ঞানের সমাহার হতে হবে এবং এ জ্ঞান হস্তান্তরযোগ্য ও অর্জনযোগ্য হতে হবে যা শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জন করতে হয়।
৩. **পেশা হবে গবেষণামূলক (Profession would be discipline of Study):** পেশা গবেষণামূলক হতে হবে। অর্থাৎ, প্রতিনিয়ত গবেষণা হতে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে নতুন নতুন কৌশল যোগ করতে হবে।
৪. **পেশাদারকে ব্যক্তিক গুণাবলির অধিকারী হতে হবে (Professional must posses personal qualities):** ব্যবস্থাপনা পেশাদারকে কিছু ব্যক্তিগত গুণের অধিকারী হতে হবে, যেমন: ধৈর্য, পূর্ণতা, বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা ইত্যাদি। তার আচরণে পেশাদারিত্ব প্রকাশ পেতে হবে।
৫. **সমিতি বা সংস্থার অস্তিত্ব (Existing of Association):** পেশার সরকার অনুমোদিত কর্তৃপক্ষ (Authority) থাকতে হবে। এ কর্তৃপক্ষ দক্ষতা ও জ্ঞানের আলোকে পেশাদারিত্ব অনুমোদন দেবে। প্রত্যেক সদস্যকে উক্ত সমিতি বা সংস্থার সদস্য হতে হবে।
৬. **আইনস্বীকৃত নীতিমালা (Code of Preofessional Conduct):** নির্দিষ্ট পেশায় নিয়োজিত সদস্যগণের কার্যধারা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য দেশের প্রচলিত আইনে নীতিমালা থাকতে হবে; যা প্রতিটি সদস্য মেনে চলবে।

উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যের আলোকে বিবেচনা করতে হবে যে, ব্যবস্থাপনা একটি পেশা কিনা। ১৯৬৩ সালে Ray A. Killan কর্তৃক রচিত গবেষণাপত্রে ব্যবস্থাপনাকে পেশা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, যা আমেরিকান ব্যবস্থাপনা সমিতি (AMA) কর্তৃক সমর্থন দেওয়া হয়। Ray A. Killan বলেন, ব্যবস্থাপনা দক্ষতার সাথে চিহ্নিত নীতিমালা নিয়ে সত্যিকার পেশা হিসাবে আবির্ভূত হয়।

অধিকন্তু, আমেরিকান ম্যানেজমেন্ট এ্যাসোসিয়েশন (AMA) নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের কারণে ব্যবস্থাপনাকে পেশা হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন:

১. ব্যবস্থাপনা হলো কতিপয় জ্ঞানের সমষ্টি যা স্থানান্তরযোগ্য। ব্যবস্থাপনায় কতিপয় মৌলিক নীতি রয়েছে যা চিহ্নিত ও চর্চা করা যায়।
২. এটি বৈজ্ঞানিক ধারা অনুসরণ করে। ব্যবস্থাপনা কাজের নির্দিষ্ট ধরন রয়েছে।
৩. এর নির্দিষ্ট দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োজন যা ব্যবস্থাপনা কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে ব্যবহৃত হয়।
৪. এটি কতিপয় নৈতিকতার সমন্বয় ঘটায়। ব্যবস্থাপকগণ অতি বিবেকবান, সচেতন ও নির্দিষ্ট দর্শনে বিশ্বাসী।
৫. এর প্রয়োজনীয় শৃঙ্খলা রয়েছে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, ব্যবস্থাপনা একটি পেশা হিসাবে পরিগণিত। কারণ, বর্তমানকালে ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি, কোর্স ও প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল চালু হয়েছে। যেমন: বিবিএ, এমবিএ, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন, কার্য পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপনায় বিশেষজ্ঞ লোক নিয়োগ করছে। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন দেশে ব্যবস্থাপনা পেশায় নিয়োজিতদের সমিতিও গড়ে উঠেছে। এসব দিক বিবেচনাপূর্বক বলা যায় যে, ব্যবস্থাপনা একটি পেশা।

বাংলাদেশেও ব্যবস্থাপনা একটি পরিপূর্ণ পেশা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এদেশেও বিবিএ, এমবিএ, ডিগ্রি দেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এবং তারা ভালো করছে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে, BIM, BIBM, IBA, DU বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়। সুতরাং ব্যবস্থাপনা একটি পরিপূর্ণ পেশা হিসাবে বাংলাদেশে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই।

শিক্ষার্থীর কাজ :	শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন কোম্পানির কেস স্টাডি করে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পর্কে খাতায় লিখুন।

সারসংক্ষেপ

ফ্রেড ডেনি একজন ব্যক্তির নাম। তার নামানুসারেই কোম্পানির নাম রাখা হয়। প্রতিষ্ঠানটি মূলত: বিভিন্ন সেক্টরে প্রকৌশলের কাজ করে। বিশেষ করে মিসাইল পরিচালন সিস্টেম নকশাকরণের কাজ করে। ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ফ্রেড ডেনির বক্তব্য হলো- ব্যবস্থাপককে সব সময় অন্তরঙ্গ পদ্ধতির ভিত্তিতে (Closed system basis) কাজ করতে হবে। ব্যবস্থাপককে অধীনস্থদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি ক্ষুদ্র বিষয়েও তাদের সাথে পরামর্শ করতে হবে এবং কঠোর নিয়ম ও প্রক্রিয়ার চালু করতে হবে যেন তারা ভুল না করতে পারে। আইবিএম (IBM) একটি বিখ্যাত কম্পিউটার কোম্পানি। বিশ্বব্যাপী এর সুনাম রয়েছে। কোম্পানিটি সুনাম অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার যে ভূমিকা হলো- পণ্য বৈচিত্র্যকরণ করা হতো। এ ছাড়াও- ওয়াটসন ভালো কর্মী নিয়োগ দিলেন, তাদেরকে দিয়ে কার্যদল তৈরি করলেন এবং মুক্ত যোগাযোগ চ্যানেল স্থাপন করলেন। যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হতো। এ ছাড়াও আইবিএম এর আর একটি পলিসি ছিল- চাকরির নিরাপত্তা। কর্মীদেরকে ভালো বেতন দেওয়া হতো। একটা সময় কর্মীদেরকে কোম্পানির স্টক ক্রয়ের সুযোগ দেওয়া হয়, যা অনেককেই ধনীতে রূপান্তর করে। 'ইউনিলিভার' একটি বহুল পরিচিত নাম। এটি এত বড় কোম্পানি যে, বলা হয়- ইউনিলিভারের সূর্য অস্ত যায় না। কোম্পানিটি দ্বৈত কাঠামো দ্বারা পরিচালিত। কারণ, দুটি কোম্পানি একত্রিত হয়ে কাজ করছে। একটি লন্ডনভিত্তিক আর একটি জার্মানিভিত্তিক। তবে এর শেয়ারহোল্ডারগণ সকলেই কোম্পানির সুবিধা ভোগ করে থাকে। কোম্পানিটি তিন সদস্যের বিশেষ কমিটি দ্বারা পরিচালিত। দুই কোম্পানির দুইজন চেয়ারম্যান ও একজন সিনিয়র পরিচালক, এ কমিটির অন্তর্ভুক্ত। কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ সকল সিদ্ধান্ত এ কমিটি কর্তৃক গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও আরও ১৫ পরিচালক রয়েছেন যারা বিভিন্ন বিষয়ে সরাসরি কমিটির সাথে যোগাযোগ করে। এছাড়াও পণ্যের কৌশল উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য রয়েছেন বহু সংখ্যক সমন্বয়কারী। কোম্পানিটি বিভিন্ন দেশে অবস্থিত শাখার জন্য স্থানীয় ব্যবস্থাপক নিয়োগ দিয়ে থাকে। কারণ, স্থানীয়রা চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে বেশি। কোম্পানির রয়েছে তিন বছরের জন্য সম্ভাব্য বিক্রয়, জনবলের সংখ্যা, প্রত্যাশিত নগদ প্রবাহ, মুনাফা বৃদ্ধির হার প্রভৃতি পরিকল্পনা। বিশেষ কমিটি এ উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদন দিয়ে থাকে। বিশ্বব্যাপী সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে ব্যবসায় পরিকল্পনা করা হয়। বাংলাদেশে ব্যবস্থাপনা পেশা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। কারণ, দেশে এখন ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণের জন্য অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। যেমন: বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিবিএ, এমবিএ ডিগ্রি দেওয়া হচ্ছে, আইবিএ এ ব্যাপারে অনেক এগিয়ে গেছে। বিআইবিএম, বিআইএমসহ বহুসংখ্যক প্রফেশনাল প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে এবং দক্ষ ম্যানেজার তৈরি করছে।

পাঠ-৬.৬ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার পার্থক্য; বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার সমস্যা ও সমাধান

Differences between Indigenous Management & International Management; Problems of International Management in Bangladesh; Ways of Removing the problems in International Management in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার পার্থক্য সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার সমস্যা সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- বাংলাদেশে আন্তর্জাাতিক ব্যবস্থাপনার সমস্যার সমাধান সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার পার্থক্য

Differences between Indigenous Management & International Management

ব্যবস্থাপনাকে বিভিন্ন পরিবেশ ও প্রেক্ষাপটে কাজ করতে হয়। অবস্থার ভিন্নতার কারণে ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি সম্পাদনের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। নীচে এ সকল পার্থক্য তুলে ধরা হলো:

পার্থক্যের বিষয়বস্তু	দেশীয় প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা	আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা
১. পরিকল্পনা (Planning)	এ ক্ষেত্রে দেশীয় বা জাতীয় বাজারকে সামনে রেখে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।	এ ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী বাজারকে সামনে রেখে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।
২. সংগঠন (Organization)	দেশের অভ্যন্তরে কার্যাবলি সম্পন্ন করার উপযোগী প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের কাঠামো গড়ে তোলা হয়।	এ ক্ষেত্রে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কার্যক্রম পরিচালনার উপযোগী প্রতিষ্ঠান ও কাঠামো গড়ে তোলা হয়।
৩. কর্তৃত্বের ধারা (View of Authority)	এ ক্ষেত্রে কর্তৃত্বের ধারা সকল প্রতিষ্ঠানে প্রায় একই রকম থাকে।	এ ক্ষেত্রে কর্তৃত্বের ধারা দেশ-স্থান-কাল-পাত্রভেদে বিভিন্নরকম হয়ে থাকে।
৪. কর্মিসংস্থান (Staffing)	এ ক্ষেত্রে দেশীয় শ্রম বাজার হতে ব্যবস্থাপক ও শ্রমিক-কর্মী সংগ্রহ করা হয়।	এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শ্রম বাজার হতে ব্যবস্থাপক ও শ্রমিক-কর্মী সংগ্রহ করা হয়।
৫. ব্যবস্থাপকদের পরিচিতি (Manager Orientation)	ব্যবস্থাপকদের দেশীয় পরিবেশ ও শ্রমিক-কর্মীদের নিয়ে কাজ করতে হয় বিধায় তাদের পরিচিতি প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সীমাবদ্ধ থাকে এবং তাদের কোনো জটিল পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হয় না।	এ ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকদের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন পরিবেশ থেকে আসা লোকদের নিয়ে কাজ করতে হয়। তাই তাদেরকে নতুন পরিবেশের জটিলতা মোকাবিলা করতে হয়।
৬. নেতৃত্ব ও প্রেষণা (Leadership & Motivation)	এ ক্ষেত্রে একই সংস্কৃতি থেকে আসা প্রায় একই দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন লোকদেরকে নেতৃত্ব ও প্রেরণা দিতে হয়। তাই এটি খুব একটা জটিল নয়।	এ ক্ষেত্রে কর্মীরা বিভিন্ন পরিবেশ থেকে আসে। তাদের সংস্কৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন রকমের। তাই তাদেরকে নেতৃত্ব দান ও প্রেষণা

		প্রদান করা খুবই কঠিন কাজ।
৭. যোগাযোগের পরিধি (Communication Scope)	যোগাযোগের পরিধি ছোটো। কারণ, ব্যবস্থাপকদের প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে যোগাযোগ করতে হয়।	যোগাযোগের পরিধি ব্যাপক। কারণ, ব্যবস্থাপকদেরকে বিভিন্ন দেশের সাথে যোগাযোগ করতে হয়।
৮. নিয়ন্ত্রণ (Controlling)	নিয়ন্ত্রণ সহজ। কারণ, রিপোর্টিং সিস্টেম মোটামুটি একই রকম।	নিয়ন্ত্রণ জটিল। কারণ, রিপোর্টিং পদ্ধতি জটিল।

সুতরাং দেখা যায় যে, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে উল্লিখিত পার্থক্যসমূহ বিদ্যমান। এতে দেখা যায় যে, দেশীয় প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার তুলনায় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা বেশ জটিল ও কঠিন।

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার সমস্যা
Problems of International Management in Bangladesh

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের ৮৫ ভাগ লোক কৃষিজীবী এবং গ্রামে বসবাস করে। এ দেশে শিল্পের প্রত্যাশিত প্রসার ঘটেনি। তাই এর প্রশাসনিক দিকটাও দুর্বল রয়ে গেছে। বিশ্বায়নের এ যুগে সর্বদিকে সমানভাবে সাড়া দিতে না পারলে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা অসম্ভব। যাহোক, বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কতিপয় সমস্যা বিদ্যমান। নীচে এগুলো আলোচনা করা হলো:

১. **উপযুক্ত সুষ্ঠ পরিবেশের অভাব (Lack of Enabiling Environment):** ব্যবসায়িক পরিবেশ বলতে ব্যবসায় আইন-কানুন ও নিয়ম-নীতিকে বুঝায়, যা সকলেই মেনে চলতে বাধ্য থাকবে। বাংলাদেশে কিছু আইন আছে ঠিকই কিন্তু তার বাস্তবায়ন নাই। তদুপরি বাংলাদেশের মানুষ আইনকানুনের ধার ধারে না। অর্থাৎ তারা আইন অমান্য করে অভ্যস্ত। সুতরাং এ ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের যথাযথ ব্যবস্থাপনা করা কঠিন।

২. **ঘুষ ও দুর্নীতি (Bribery & Corruption):** বাংলাদেশে যে-কোনো সেক্টরেই হোক না কেন, কর্মচারী-কর্মকর্তাদের ঘুষ গ্রহণপ্রবণতা ও দুর্নীতির কারণে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপকগণ তাদের কার্যক্রম সাবলীলভাবে পরিচালনা করতে পারে না। যে-কোনো ভাবেই হোক এটিকে কমিয়ে আনতে হবে এবং রোধ করতে হবে।

৩. **আমলাতান্ত্রিকতা (Bureaucracy):** বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র এখনও পুরনো ব্রিটিশদের মতো। যে-কোনো বিষয়কে আমলারা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না। তারা দ্রুত সিদ্ধান্ত দেয় না। আবার, অনেক ক্ষেত্রে তাদের অদক্ষতার কারণেও সমস্যার সৃষ্টি হয়। যাহোক, আমলাতন্ত্র সহজ না হলে দেশে আশানুরূপ বৈদেশিক বিনিয়োগ আসবে না।

৪. **স্বচ্ছতার অভাব (Lack of Trransparency):** বাংলাদেশে উচ্চ পর্যায়ের যে-কোনো কাজে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। বিশেষ করে সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে (Procurement) স্বচ্ছতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এর প্রভাব বিদেশি কোম্পানিতেও পড়ে।

৫. **আইনের প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে দুর্বলতা (Weakness in Enforcement & Implimentation of Laws):** ব্যবসায় শিল্প পরিচালনা করতে কিছু আইনকানুন মেনে চলতে হয়। বাংলাদেশে ব্যবসায়ী, শিল্পপতি বা উদ্যোক্তাদের মধ্যে আইন মোতাবেক চলার অভ্যাস কম। বিদেশি বিনিয়োগকারীগণ এতে অভ্যস্ত নন। তাই আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয়।

৬. **কপিরাইট অবহেলিত এবং নকল প্রবণতা ব্যাপক (Copy right Abuse & Piracy Widespread):** বাংলাদেশে যে-কোনো পণ্য নকল করা সহজ। এখানে বিদেশি পণ্যের অবিকল নকল করে বাজারে ছাড়ছে চোরাকারবারিরা। এতে একদিকে মানুষ প্রতারিত হচ্ছে পণ্য ক্রয় করে, অন্যদিকে আসল কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে বিক্রি কমে যাওয়ার ফলে।

৭. **বাজারজাতকরণ কৌশল (Marketing Strategy):** বাংলাদেশে যে ধরনের বাজারজাতকরণ কৌশল অনুসরণ করা হয়, বিদেশি কোম্পানি সেভাবে মানিয়ে নিতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ ঔষধ কোম্পানির কথা বলা যায়। বাংলাদেশি কোম্পানিগুলো ডাক্তারদেরকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকে সংশ্লিষ্ট ওষুধ ব্যবস্থাপত্রে উল্লেখ করার জন্য। এটি বিদেশি কোম্পানি করতে পারে না। ফলে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয়।

৮. **তীব্র প্রতিযোগিতা (Tiff Competition):** বাংলাদেশের বাজার তুলনামূলকভাবে ছোটো। তাই প্রতিযোগিতা বেশি। এখানে জনগণ পণ্যের মূল্য সম্পর্কে খুব সচেতন। যারা সবচেয়ে কমমূল্যে পণ্য বিক্রি করতে পারবে, তারাই টিকে যাবে। এ ক্ষেত্রে চীন ও ভারতের উদাহরণ দেওয়া যায়। এ দুইদেশের পণ্য অত্যন্ত কম মূল্যে বিক্রি হয় এ দেশে। এটি অন্য কোম্পানিগুলোর জন্য সমস্যা।

৯. **অভিজ্ঞ ব্যবস্থাপকের অভাব (Lack of Experienced Managers):** বাংলাদেশে অভিজ্ঞ ব্যবস্থাপকের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। ফলে বিদেশিদের সাথে ব্যবসায় করতে সমস্যায় পড়তে হয় উদ্যোক্তাদেরকে। অর্থাৎ, ব্যবস্থাপকগণ দক্ষতার সাথে ব্যবস্থাপনার কার্য পরিচালনা করতে পারে না।

১০. **রাজনৈতিক চাপ (Political Pressure):** বাংলাদেশে একটি সাধারণ প্রবণতা হলো- সর্বক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব খাটানো। ফলে ব্যবস্থাপকগণ গণতান্ত্রিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। এতে সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়।

সুতরাং বলা যায় যে, উপর্যুক্ত উপাদানগুলো আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। ফলে ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম সাবলীলভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয় না।

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের উপায়

Ways of Removing the problems in International Management in Bangladesh

বাংলাদেশের অর্থনীতি এখনও কৃষিভিত্তিক। কৃষির ফলন ভালো হলে জিডিপির প্রবৃদ্ধি ভালো হয়। আর তা না হলে সমস্যার সৃষ্টি হয়। যাহোক, বাংলাদেশে শিল্পের দিকে অনেক এগিয়ে গেছে। বিশেষ করে পোশাক শিল্প, ওষুধ শিল্প, চামড়াশিল্প বহুদূর এগিয়ে গেছে এবং জিডিপিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। বিশ্বায়নের এ যুগে বিশ্বের সকল দেশই তার পছন্দমত দেশে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও ব্যবসায় পরিচালনা করতে পারে। বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে বাংলাদেশে ব্যবস্থাপনা কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে কতিপয় সমস্যা রয়েছে, যা দূরীভূত করা আবশ্যক। নীচে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

১. বাংলাদেশে আইনগত পরিবেশ ব্যবসায়বান্ধব হতে হবে। সরকারকে এ বিষয়ে নজর দিতে হবে।
২. ঘুষ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করতে হবে সংশ্লিষ্ট সকলকে।
৩. আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কমিয়ে আনতে হবে যেন দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা যায়।
৪. ক্রয়-কার্যক্রম (Procurement) যথেষ্ট স্বচ্ছতা অবলম্বন করতে হবে।
৫. শক্ত হাতে আইনের প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।
৬. নকল প্রবণতাকে প্রতিরোধ করতে হবে।
৭. বাজারজাতকরণ কৌশলে সংশ্লিষ্ট সকলে মিলে পরিবর্তন আনতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোনো রকম ঘুষ, উপঢৌকন বা অন্য কোনোভাবে প্ররোচিতকরণ কৌশল ব্যবহার করা যাবে না, এটি নিশ্চিত করতে হবে।
৮. প্রতিযোগিতা মোকাবিলা করার জন্য পণ্যের মূল্য, মান ও উপযোগিতা ঠিক রাখতে হবে।
৯. ব্যবস্থাপকদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করত: দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে।
১০. কোম্পানির প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক চাপকে উপেক্ষা করতে হবে।
১১. বিশ্বের ব্যবসায় পরিবেশ-পরিস্থিতি মূল্যায়নপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, উপর্যুক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ ও সর্বোপরি সুশাসন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ :	শিক্ষার্থীরা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন এবং বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান সমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কে খাতায় লিখুন।

সারসংক্ষেপ

ব্যবস্থাপনাকে বিভিন্ন পরিবেশ ও প্রেক্ষাপটে কাজ করতে হয়। অবস্থার ভিন্নতার কারণে ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি সম্পাদনের ক্ষেত্রেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পার্থক্যটা বেশি পরিলক্ষিত হয়। পরিকল্পনার ক্ষেত্রে দেশীয় বাজারকে সামনে রেখে পরিকল্পনা করা হয় আর বিশ্বব্যাপী বাজারকে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এমনিভাবে ব্যবস্থাপনার সমস্ত কার্যক্রম দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে সম্পাদন করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বহুবিধ সমস্যা রয়েছে; যেমন: এখানে আইনগত পরিবেশ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের জন্য উপযোগী নয়। দুর্নীতিসংক্রান্ত সমস্যা আছে। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, ক্রয়ে অস্বচ্ছতা, নকল প্রবণতা, বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতা প্রভৃতি সমস্যা বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে রয়েছে। তবে কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এ সকল সমস্যা দূর করা যায়। যেমন: আইনগত পরিবেশ উন্নত করতে হবে, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কমিয়ে আনতে হবে যেন দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়, নকল প্রবণতা রোধ করতে হবে, এ ব্যাপারে আইন-প্রয়োগকারী সংস্থাকে কাজে লাগাতে হবে এমনিভাবে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান সমস্যা দূর করা যায়।

ইউনিট উত্তর মূল্যায়ন

১. আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা বলতে কী বুঝায়? আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
২. আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
৩. আন্তর্জাাতিক ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি লিখুন।
৪. আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের পদ্ধতি বা ধরনসমূহ আলোচনা করুন।
৫. লাইসেন্সিং ও ফ্রাঞ্চাইজিং এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।
৬. আন্তর্জাতিক কৌশল কী? আন্তর্জাাতিক ব্যবসায়ে সফলতার উপাদানসমূহ বর্ণনা করুন।
৭. আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের ঝুঁকিসমূহ কী?
৮. পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনা পরিবেশের সংজ্ঞা দিন। ব্যবস্থাপনা পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহের বিবরণ দিন।
৯. আন্তর্জাতিক পরিবেশ কী? আন্তর্জাতিক পরিবেশের উপাদানসমূহ আলোচনা করুন।
১০. আন্তর্জাতিক পরিবেশের উপাদানসমূহের চ্যালেঞ্জগুলো কী? একজন ব্যবস্থাপককে কেন ব্যবসায় পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়?
১১. বহুজাতিক কোম্পানি কী? বহুজাতিক কোম্পানির পরিবর্তন সম্পর্কে আলোকপাত করুন।
১২. বহুজাতিক কোম্পানির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ লিখুন।
১৩. ফ্রেড ডেনি (Fred Denny)-এর মতে ব্যবস্থাপনাকে অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত করা যায় কীভাবে?
১৪. আই বি এম কোন ধরনের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ করে?
১৫. ইউনিলিভার কো. লি. এর সফলতার কারণসমূহ লিখুন।
১৬. বাংলাদেশে ব্যবস্থাপনা কি পেশা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে? উত্তরের স্বপক্ষে জবাব দিন।
১৭. বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান সমস্যা ও তার সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

সহায়ক গ্রন্থ:

- Kathrya M. Bartol & Deavid C. Martin, "Management", 2nd Edition, McGraw-Hill, INC, USA, 1994.
- HeinZ Weihrich & Harold Koontz, "Management", 10th Edition, McGraw-Hill, INC, USA, 1994.
- Bazlul Hoque Khandoker, "Management Systems in Bangladesh & Japan: A comparative Study.